সমাজশিক্ষার ভূমিকা

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫২
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৫৪
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৫৮

দাম ঃ আড়াই টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমন্মথনাথ পান কর্তৃক ১।১, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৬ কে. এম. প্রেস হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

—মাতাপিতার শ্রীচরণে—

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'সমাজশিক্ষার ভূমিকা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গল্প-উপন্যাস-প্লাবিত বইয়ের বাজারে একখানা শিক্ষা-বিষয়ক বইয়ের পক্ষে ইহা কম সান্ত্বনার কথা নহে। সমাজ-সেবকের নিকট বইখানা যে কিঞ্চিৎ সমাদর লাভ করিয়াছে গ্রন্থকারের ইহাই ঈপ্সিত পুরস্কার।

সমাজশিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বর্তমানে ১১৮টি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক বা অঞ্চল (N. E. S. Block) ব্যাপিয়া সমাজশিক্ষা প্রসার লাভ করিতেছে। আগামী পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট তিন-শতাধিক জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক স্থাপিত হইবে এবং সমগ্র পল্লী-অঞ্চলই সম্প্রসারণ কার্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হইবে। সমাজ-সেবক ও শিক্ষকগণের দায়িত্বও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহাদের হাতেই এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ অর্পিত হইল। এই সংস্করণে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব অধ্যায়গুলিকেও সময়োচিতভাবে কিছু পরিবর্তিত ও পরি-মার্জিত করা হইয়াছে। ইতি

কলিকাতা —গ্রন্থকার

৪।১।৫৮

সূচীপত্র

সমাজশিক্ষার ভূমিকা

সমাজশিক্ষার সওয়াল

সভ্যজগতের সর্বত্রই শিক্ষায় মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। শুধু স্বীকৃতিই নয়, জগতের সভ্য রাষ্ট্রমাত্রেই শিক্ষাকেই আজ সর্বজনীন ও সর্বজনভোগ্যা করিয়া তুলিবার জন্য বিপুল প্রয়াস চলিতেছে। সর্বজনীন শিক্ষার তাগিদ আজ যেমন অনিবার্যভাবে অনুভূত হইতেছে, পুরাকালে ততটা কোন দিনই হয় নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় সভ্যতারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। গ্রামকেন্দ্রিক ও ভূমিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ যে-সঙ্কীর্ণ পরিবেশে বাস করিত, সে-পরিবেশের চাহিদা মিটাইতে মানুষকে ক্বচিৎ নিজ গ্রাম-গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হইত। গ্রাম-সমাজ ছিল প্রায় আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। দু'চারজন দিগ্বিজয়ী রাজা, দুঃসাহসী সওদাগর বা সৌখীন অনুসন্ধানী দেশ-পর্যটকের কথা বাদ দিলে একথা বলা চলে যে, 'সাধারণ' লোকের কাছে নিজ গ্রামের বাহিরের জগৎটাই ছিল প্রায় অজ্ঞাত ও অপরিচিত। স্বল্পে তুষ্ট জীবন-যাত্রায় বহির্জগতের সহিত কোন যোগসূত্রের প্রয়োজনীয়তা বড় একটা অনুভূত হইত না। শিক্ষার ক্ষেত্রও ছিল ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত। জীবনযাত্রা-সমস্যা আজিকার মতো এতো জটিল

হইয়া উঠে নাই। সরল সাদাসিধা জীবনে যে-সামান্য শিক্ষার প্রয়োজন, সে-শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালার আনুকূল্যেই লাভ করা সম্ভব হইত পল্লীসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে। সেই পাঠশালার শিক্ষাটুকুও সহজলভ্য ছিল না এবং উহা অর্জন করিতেই হইবে, তেমন কোন তাগিদও ছিল না। সংস্কৃতিমূলক উচ্চাঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্র ছিল আরও সঙ্কীর্ণ। রাজদরবার, অভিজাতমহল, মধ্যযুগীয় মঠ-মন্দির ইত্যাদির আওতার বাহিরে কাব্য-কলা-সঙ্গীত প্রভৃতির আলোচনা-অনুশীলনের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল ছিল। শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয় মাধ্যম—ছাপাখানা ও কাগজ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ভূর্জপত্র বা হাতে-তৈরী কাগজে লিখিত কাব্য-সাহিত্য আজিকার দিনের মতো হাজার হাজার লাখ লাখ পাঠক-পাঠিকার পাঠতৃষ্ণা মিটাইতে সমর্থ হইত না। মহাকবি কালিদাসের কাব্য-ঝঙ্কার যে প্রধানতঃ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার মনোরঞ্জনেই উদ্‌গীত হইত, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি! বিজ্ঞানের আনুকূল্যে আজ আর মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি হস্তলিখিত পুঁথির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নাই; দেশ-দেশান্তরে উহা প্রকীর্ণ হইতেছে। কালিদাসের কাব্য, সেক্সপীয়ারের নাটক, বিটোভেনের সুর দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই পাশ্চাত্ত্যদেশগুলিতে সর্বজনীন জনশিক্ষার প্রথম উদ্যম দেখা যায়। নানা

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ প্রকৃতির বহু রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করিতে লাগিল, নানা শক্তি মানুষের করায়ত্ত হইল, পার্থিব জগতের নানা সম্পদে মানুষের অধিকার জন্মিল। এক কথায়, মানুষ যেন দৈন্য-দুর্দশার যুগ উত্তীর্ণ হইয়া এক বৈভবের যুগে আসিয়া উপস্থিত হইল। পৃথিবীর ধনসম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, মানুষের জীবনের মান উচ্চতর হইয়া উঠিল এবং কেবল পার্থিব অর্থেই নহে, মানসিকতার দিক দিয়াও মানুষ বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পাইল। যে বহিঃপ্রত্যক্ষ ঘটনাপুঞ্জ এই বিরাট পরিবর্তনের মূলে—ইতিহাসে তাহার নাম শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution)। বিগত শতকে ইংলণ্ডের কথাই বিবেচনা করা যাউক। অনেকাংশেই উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংলণ্ডের সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত ভারতের বর্তমান অবস্থার বেশ একটা আনুরূপ্য লক্ষ্য করা যায়। ভূমিঘনিষ্ঠ সমাজ শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় কেন্দ্রচ্যুত হইতেছে। বড় বড় শহর ও শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে। ভূমিহীন শ্রমজীবী শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলিতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া আসিতেছে। জীবনের সনাতন মান ও মূল্যবোধ নূতন মান ও মূল্যায়নকে স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। জীবনসমস্যা জটিল ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। গ্রাম্যজীবনের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্বপ্ন ও সত্যকে আর আবদ্ধ করিয়া রাখা

যায় না। বিশ্ব-জগতের সীমানা আজ বহুদিকে বহুদূর সম্প্রসারিত।

শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতেই সভ্য প্রগতিশীল দেশগুলি সর্বজনীন জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছে; আগে যে-বিশেষ ধরণের শিক্ষা রাজদরবার, অভিজাত মহল বা মঠে-মন্দিরে অনুশীলিত হইত, তাহা দ্বারা শিল্পপ্রধান সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। শিক্ষা-ধন্য মুষ্টিমেয়ের বদলে সমষ্টির শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির নিত্য নূতন আবিষ্কার, কলকারখানা-পরিচালনার নিত্য নব কৌশল, শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ত্বরান্বিত করিল। সাধারণ মানুষ নূতন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রাপ্ত হইল। ক্রমশঃ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করিল। এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে 'মিড-লোথিয়ান ক্যাম্পেন' নামে খ্যাত এক উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষ্যে তদানীন্তন লিবারেল দলনেতা বিখ্যাত রাজনীতিক উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোনের উক্তি: "Educate your Masters"—বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। নূতন রাষ্ট্রীয় অধিকার-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেই অধিকারের প্রকৃত অর্থ বুঝিবার তাগিদ আসিল। ইহা সর্বজনীন শিক্ষার একটা বড় তাগিদ। অজ্ঞ নাগরিকের কাছে তাহার দায়িত্ব ও অধিকার মূল্যহীন। নাগরিকতার মূল সংজ্ঞাই হইতেছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চেতনা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের

মূলভিত্তি জনসাধারণের নাগরিকতা-বোধ। শিক্ষা ভিন্ন বর্তমান যুগে সামাজিক চেতনার উন্মেষ হইতে পারে না। তাই সর্বজনীন জনশিক্ষা গণতন্ত্রের মূলনীতির অন্যতম। ভারতীয় সংবিধানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারত রাষ্ট্রের প্রত্যেক শিশুকেই একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে শিক্ষালাভ করিতে হইবে—এইরূপ একটা বিশেষ অনুচ্ছেদ বিধিবদ্ধ রহিয়াছে।

উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লব, ভূমি-সংস্কার, ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ ইত্যাদির সহিত প্রায় যুগপৎ সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হইয়াছিল। ১৮৩২ হইতে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত—পঁয়ত্রিশ বৎসর এই অগ্রগতির কাল। এই সময় হইতেই ইংলণ্ডে জনশিক্ষা সর্বব্যাপকতা অর্জন করে।

আজ আমরা ভারতবাসী অনেকটা সেই উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই নাই কি? প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় শিল্প ও উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধিসাধন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, দেশ ও সমাজ-পুনর্গঠন ইত্যাদি বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আসমুদ্র হিমাচল সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা-প্রবর্তনের আশু তাগিদ দেখা দিয়াছে। আমরা অতি দ্রুততালে যে-যুগান্তরের অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করিতেছি, দেশের আপামর জনসাধারণকে সেই দ্রুতগতির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে না শিখাইলে অভিযান ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

সেদিন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শতবর্ষ-পূর্তির সমাপ্তি-উৎসব উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজী তাঁহার ভাষণে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। ভাখরা-নাঙ্গালের বিরাট বাঁধ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়াছেন জওহরলালজী। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব কিছুই দেখিতেছেন পরম আগ্রহের সহিত। সঙ্গে বহুলোক—ইঞ্জিনীয়ার, টেক্‌নিশিয়ান, অ্যাড্‌মিন্‌স্ট্রেটর প্রভৃতি। ইঁহারা প্রায় সকলেই একটু মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহের সহিতই প্রধানমন্ত্রীকে নানা বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন। মাটি কাটিয়া পর্বতপ্রমাণ বাঁধ তৈরি করা হইতেছে। বিদ্যুৎ-উৎপাদন গৃহটির বিপুল কলেবর বিস্ময় সৃষ্টি করিতেছে। আর, অদূরে একদল স্ত্রী ও পুরুষ-মজুর কর্তিত মাটি ঝুড়িতে বহন করিয়া নির্মীয়মান বাঁধের উপর ফেলিতেছে। সহসা জওহরলালজী অত্যুৎসাহী অফিসারগণকে প্রশ্ন করিলেন ঃ "আপনারা আমাকে যেরূপ যত্নের সহিত এই বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা ঐ নিরক্ষর শ্রমিকদের কাছেও কি এই পরিকল্পনার মূলবাণীটি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন ?" অফিসারগণের নেতিবাচক উত্তরে জওহরলালজী ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ঐ স্ত্রী ও পুরুষ-শ্রমিকদিগের কাছে গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "বল ত, এখানে যে কাজ হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি ?" তাহারা বলিল ঃ "হুজুর, আমরা মাটি কাটি, তার বেশি কিছুই জানি না।" প্রধানমন্ত্রী তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যটি, বুঝাইয়া দিলেন

যে, এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধাই বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমিকদল সন্তুষ্ট হইল। এতোদিন যাহারা কলুর বলদের মতো মাটির বোঝা বহিতেছিল, আজ যেন তাহাদের অন্ধত্ব ঘুচিয়া গেল। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করিতেছে জনশিক্ষা-পরিকল্পনার সাফল্যের উপর। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের উক্তিটিও বিশেষ অর্থবাচক : "Illiterate masses can have no Socialism."

সর্বব্যাপক জনশিক্ষার স্বপক্ষে রাজনৈতিক সওয়াল ছাড়া অন্য যুক্তির প্রাবল্যও কম নহে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ আজ বিপুল পার্থিব সম্পদ এবং মানসৈশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু এই অপরিমিত ঐশ্বর্যের মধ্যেও সাধারণ মানুষের দৈন্য ও রিক্ততা অবর্ণনীয়। বিশ্বসংস্কৃতি-সংসদের (UNESCO) খতিয়ানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধাধিক মানুষ এখনও নিরক্ষর ও শিক্ষাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ; আর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই চরম দারিদ্র্যদশায় জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে। মানুষের এই নিদারুণ দৈন্যদশা যে কেবল আর্থিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ—তাহা নহে, মানসৈশ্বর্যের ভাগ হইতেও সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। যতোদিন অবধি শিক্ষায় মানুষের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে,ততোদিনই এই দুরবস্থা কায়েম থাকিবে। ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরী। কতো নূতন ভাবধারাই না এই মহানগরী হইতে উৎসারিত হইয়া সারা ভারতময় নব নব আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে ! বসু-বিজ্ঞানমন্দির, আণবিক বিজ্ঞানাগার,

জাতীয় গ্রন্থশালা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, রবীন্দ্রভারতী এবং আরো কতো উচ্চাঙ্গীয় শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান এই মহানগরীর মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে। কতো মনীষী, কতো চিন্তানায়ক, কতো সাহিত্যস্রষ্টা, কতো কবি, কতো দার্শনিক, কতো রাজনীতিক এই মহানগরীর ধূলিপুঞ্জকে তীর্থমাহাত্ম্যে মহিমান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিপুল মানসোৎকর্ষের প্রসাদ সাধারণ কলিকাতাবাসী তথা দেশের জনসাধারণের ভাগ্যে কণামাত্রও কি জুটিতেছে! গজদন্ত-নির্মিত গম্বুজে সাধারণের নাগালের বাহিরে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা কি চিরকাল সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে? রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীরই কি জাতীয় সংস্কৃতির স্নিগ্ধধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার অধিকার নাই? এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নৃত্যছন্দের অভিব্যক্তি, আর ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সুরঝঙ্কারের অনুরণন, কি রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী কাব্য-ব্যঞ্জনা, কি অবনীন্দ্রনাথের লীয়ায়িত তুলিরেখা—যাহা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তাহা কি কেবল মুষ্টিমেয়ের মনোরঞ্জনের জন্যই!

শিক্ষার ক্ষেত্র-পরিধি যতোদিন সঙ্কীর্ণ ছিল, ততোদিনই জনসমাজের বৃহত্তর অংশটি এক অনাবিষ্কৃত মহাসমুদ্রের মতোই অজ্ঞাত, অসার্থক অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আজ সেই অনাবিষ্কৃত মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া নব নব রত্ন-মাণিক্য আহরণ করিবার সময় আসিয়াছে। জন-শিক্ষাই এই জনসমুদ্র-মন্থনের মন্থন-দণ্ড। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দ্বারাই জাতি ও সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন সম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইউরোপখণ্ডের ক্রমোন্নতিশীল দেশগুলিতে শৈশব-কৈশোর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শিক্ষার কথাও শিক্ষাবিদ্ ও সমাজসেবিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। স্কুল-কলেজের নির্ধারিত বয়ঃসীমার বহির্ভূত সংখ্যাগুরু প্রাপ্তবয়স্কগণের শিক্ষার অথবা Adult education-এর স্বপক্ষে একটি প্রধান যুক্তি—জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষার শেষ নাই ; যতোদিন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে, ততোদিনই তাহার শিক্ষার প্রয়োজন। মানুষ প্রগতিশীল। নিত্য নব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান শিক্ষারই নামান্তর। প্রতিনিয়তই মানুষ এই সামঞ্জস্যবিধান করিয়া লইতেছে এবং এইখানেই মনুষ্যেতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রথমে 'এডাল্ট এডুকেশন'-কথাটার মধ্যে একটা ক্ষতিপূরণ-ব্যঞ্জক অর্থ নিহিত থাকিত। অর্থাৎ যাহারা আর্থিক বা সামাজিক অন্তরায়বশতঃ যথাসময়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত থাকিত, অধিক বয়সে তাহাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান-ব্যবস্থাকেই 'এডাল্ট এডুকেশন' বলা হইত। এই 'এডাল্ট এডুকেশন' প্রকৃতপক্ষে অক্ষরপরিচয়ের প্রতিশব্দ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু 'এডাল্ট এডুকেশন'-আন্দোলন অচিরেই একটা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সংজ্ঞা লাভ করিল। কেবলমাত্র 'লিটারেসি' বা লিখন-পঠন-ক্ষমতার কার্যকর মূল্যের অকিঞ্চিৎকরতা সহজেই অনুমেয়। বৃহত্তর শিক্ষা ও জ্ঞান-রাজ্যের অপরিহার্য ছাড়পত্র হিসাবে

'লিটারেসি'র মূল্য অসীম! কিন্তু গৃহের সিঁড়ি যেমন গৃহ নহে, 'লিটারেসি'ও তেমনি শিক্ষা নহে। যে-ব্যক্তি কোনও ক্রমে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছে, তাহাকেই সাক্ষর বলা হয়, কিন্তু সদ্য-সাক্ষরের নামসহির মূল্য কতটুকু! নিরক্ষর ব্যক্তি স্বাক্ষরের বদলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিয়া থাকে। টিপসহি অনন্থকরণীয়, কিন্তু সদ্য-সাক্ষরের স্বাক্ষর সেদিক দিয়া আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে। কাজেই অক্ষরপরিচয় শিক্ষার আবশ্যিক প্রথম ধাপ হিসাবেই মূল্যবান, কিন্তু উদ্দেশ্য নহে। অল্প-বিস্তর প্রারম্ভিক চেষ্টার ফলে অক্ষরগুলিকে আয়ত্ত করিয়া নিরক্ষর নাম ঘুচান সম্ভব। কিন্তু পরবর্তী নিত্য-অনুশীলন ব্যতীত এই সদ্যোলব্ধ লিখন-পঠন-কৌশল স্থায়ী ফলপ্রসূ হইতে পারে না, এবং ইহা দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বাস্তব উপকারও সাধিত হয় না।

তাই প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা পরবর্তী অনুশীলন। আজ শিক্ষাজগতে যে কয়টি মূলনীতি গৃহীত ও অনুসৃত হইতেছে, তাহার অন্যতম কথা জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। সাক্ষরতা-অর্জনের পরবর্তী অনুশীলন জীবনব্যাপী শিক্ষারই পর্যায়ভুক্ত। যেমন একক ব্যক্তির, তেমনি সমগ্রভাবে সমাজের শিক্ষারও প্রয়োজন। তাই আজ সমাজশিক্ষা কথাটা সম্পূর্ণ অভিনব অর্থের দ্যোতক। শৈশব হইতে বার্ধক্যের শেষ সীমানা পর্যন্তই শিক্ষানুশীলন অব্যাহত চলিতে পারে। কাল-ধর্মে এবং অবস্থা-বৈগুণ্যে অবশ্যই শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতির তারতম্য হইবে এবং

শিক্ষার মাধ্যমও হইতে পারে বহু প্রকারের। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ চলিবে শিক্ষার প্রসারে। শিক্ষাপদ্ধতি হইবে কালানুগ। আবার প্রচলিত পদ্ধতিগুলির ব্যবহারও ক্ষেত্রবিশেষে অগ্রাহ্য করা চলে না। চলচ্চিত্র, বেতার-যন্ত্র এবং টেলিভিশনকে শিক্ষার সহায়ক ও সম্পূরক হিসাবে ব্যাপক ব্যবহার করা হইতেছে। দেশজ ঐতিহ্যের ধারক কীর্তন, কথকতা, মেলা, যাত্রাগান ইত্যাদিও আধুনিক শিক্ষা-মাধ্যম-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রয়োজন-বোধে প্রাচীন মাধ্যমগুলিকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আজ ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-অর্জনের পর যে-ব্যাপক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে, সেই বিপ্লবের সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে ভারতীয় জনগণের চিত্তের উদ্বোধনে। এই মূল সত্য কথাটি কোন নৈয়ায়িক-সুলভ তর্কের অপেক্ষা রাখে না। জাতীয় শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ ও সর্বজনীন বিস্তার দ্বারাই জনচিত্তের উদ্বোধন সম্ভব। তাই সমাজশিক্ষার প্রয়োজন আজ সর্বাগ্রে।

পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শিক্ষার যে সুনির্দিষ্ট বাঁধা পথ রহিয়াছে, একদিকে দেশের শিশু-কিশোর-যুবা প্রত্যেককেই সেই পথগামী হইবার সুযোগ দিতে হইবে। ৬-১১ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেকটি শিশুকেই প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বহুলাংশে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপনান্তেই

অন্ততঃ শতকরা ৭৫জন শিক্ষার্থী শিক্ষাপথে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে। বাকী পঁচিশ জন মাত্র শিক্ষার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার অধিকারী। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র পুঁথি-কেন্দ্রিক না করিয়া শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবণতার পরিপোষক এবং সৃজনধর্মী করা আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী সোপান মাধ্যমিক শিক্ষা। শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও স্বকীয়তা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাও একমুখী না করিয়া বহুমুখী করাই আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের অনুশাসন। মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় উচ্চতর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাও বহুধারাবিশিষ্ট। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে একটা খুব বড় কথাই হইতেছে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রতিভার পরিপোষণ।

আবার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে মোট জনসংখ্যার যে বিপুল অংশ রহিয়া গেল, তাহাদের জন্য এবং যাহারা স্কুল-কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়াছে, তাহাদের জন্যও এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকিবে, যাহার দৌলতে মানুষের মনকে সদা-জাগ্রত ও সদা-সক্রিয় রাখা যায়।

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বহুলাংশে আজ মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রযোজনা করিতেছে। গ্রন্থাগার আর কেবলমাত্র অবসর-বিনোদক হাল্কা সাহিত্যের বেসাতি করিয়াই নিজ উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে না। গ্রন্থাগারের দায়-দায়িত্ব আজ বহুগুণে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-পরিবর্তনশীল জীবন-পরিবেশের সহিত সমান তালে চলিবার পাথেয় জোগায় গ্রন্থাগার। সমাজশিক্ষার বাহক হিসাবে লাইব্রেরি আজ অপরিহার্য।

ব্যাপক সমাজশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ পৃথিবীর অন্যত্রের ন্যায় ভারতবর্ষেও স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তিক সরকার উভয়েই সমাজশিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সম্প্রসারণ প্রোগ্রামে সমাজশিক্ষার গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজ-সংগঠক ও সংগঠিকাগণের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা এই প্রোগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি একশ'টি বা তাহার কিঞ্চিদধিকসংখ্যক গ্রাম লইয়া এক-একটি উন্নয়ন-অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। অদ্যাবধি এইরূপ ১০৩টি ব্লক বা অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও হইবে এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গই এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইবে। জাতীয় সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক বিষয়, চলাচল ও যানবাহন, সামাজিক সংহতি, জলসেচ, কৃষি, লোকশিল্প ইত্যাদি নানা দিক হইতে দেশ-পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

এই বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সুসংহত করা সমাজশিক্ষার দায়িত্ব। এই বিরাট বিপ্লবাত্মক কর্মযজ্ঞের সহিত জনচিত্তের সংযোগসাধন করা সমাজশিক্ষার উদ্দেশ্য। সমাজশিক্ষার আনুকূল্যেই নূতন সমাজের অভ্যুদয় সম্ভবপর হইবে। সমাজশিক্ষাই জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথনির্দেশ করিবে।

সমাজশিক্ষার কৈফিয়ত

বিশ্ব-সংস্কৃতি-সংসদের (UNESCO) সংবিধানে একটি অতি সুন্দর ও অনুধাবনযোগ্য কথার উল্লেখ রহিয়াছে। কথাটি এই: "মানুষের মনেই যুদ্ধের বীজ নিহিত আছে, সুতরাং মানুষের মনেই শান্তির দেউল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" সেই শান্তি-দেউলের ভিত্তি হইবে শিক্ষা। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিখ্যাত এব্রাহাম লিঙ্কন দাসত্বপ্রথার অযৌক্তিকতা নির্দেশ-কল্পে বলিয়াছিলেন যে, যে-জাতির মাত্র অর্ধেক মুক্ত বা স্বাধীন, কিন্তু বাকী অর্ধেক দাসত্ব-শৃঙ্খলিত, সে-জাতির কোন ভবিষ্যৎ নাই। লিঙ্কনের এই উক্তি আজ সমগ্র পৃথিবীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জগতের সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই জীবন-ধারণের অতি সাধারণ ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলি হইতে বঞ্চিত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিতের ভাগ্যে বহুভোগ্যা বসুন্ধরার বিচিত্র সম্ভারপূর্ণ ভাণ্ডারের দ্বার অবরুদ্ধ। অনশন বা অর্ধাশন, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা-অজ্ঞানতা ও অভাব এই হতভাগ্যদের নিত্যকার সঙ্গী।

এই রিক্ত, বঞ্চিত মানব মহাকবির ছন্দে অমরত্ব লাভ করিয়াছে:

> "নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
> মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
> শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
> রেখে দেয় বাঁচাইয়া।"...

আজ সারাবিশ্ব মানবতার এই নগ্ন, রিক্ত রূপ দেখিয়া বিচলিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বব্যাপী অজ্ঞানতার তিমিরাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার একটা বিপুল প্রয়াস আজ সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ইউরোপীয় ভূখণ্ডের ত কথাই নাই, অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতেও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য একটা বিপুল সাড়া জাগিয়াছে। মানুষের মানসিক, পার্থিব ও নৈতিক উন্নতির মূল ভিত্তি যে শিক্ষা, ইহা আজ সর্বজনস্বীকৃত। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে হইলেও সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার একটা ব্যাপক উদ্যোগ চলিতেছে। বয়স্ক-শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, সমাজ-শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন নামীয় পরিকল্পনা মূলতঃ সেই একই প্রচেষ্টার বিভিন্ন অভিব্যক্তি।

ভারতবর্ষের কথা ভাবিয়া দেখা যাউক। দেশ স্বাধীন হইয়াছে। সার্বভৌম ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্বের দরবারে ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই আপাত-মনোহর দৃশ্যের অন্তরালে যে-রূঢ়, বাস্তব অবস্থা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। ভারতের ৩৬ কোটি অধিবাসীর শতকরা ৮৪ জনই সম্পূর্ণ নিরক্ষর। অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার নিবিড়ান্ধকারে সমগ্র দেশটি আচ্ছন্ন রহিয়াছে। অশিক্ষা হইতে উদ্ভূত সংখ্যাতীত সমস্যায় ভারতের জাতীয় জীবন খিন্ন, ক্লিষ্ট ও নিপীড়িত। কিন্তু সমস্ত সমস্যার পুরোভাগে রহিয়াছে শিক্ষা-সমস্যা। শিক্ষা ব্যতীত আত্মপ্রত্যয় জন্মে না। আত্মপ্রত্যয়

হইতেই শক্তির সৃষ্টি। শক্তিলাভ ব্যতীত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ বা জাতির উন্নতি সম্ভবপর নহে। জ্ঞান ও শিক্ষার পরিশীলন হইতেই শক্তিলাভ হইয়া থাকে। কাজেই, জাতির প্রকৃত কল্যাণের পথ—শিক্ষা। আজ আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার অভাবকেই জাতির সর্বপ্রধান অভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকিবার মৌলিক অধিকারের মতোই শিক্ষালাভের অধিকারও মানুষ মাত্রেরই মৌলিক অধিকার। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে বাঁচিবার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। কি উপায়ে এই দেশজোড়া অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করা যায়, তাহাই আজ শিক্ষা-পরিকল্পকদের প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বহুমুখী বৃত্তিমূলক বা কারিগরী শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা-প্রচেষ্টার বিভিন্ন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কগণের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথাও আলোচিত হইতেছে। শিক্ষাবিদ্ স্যার জন সার্জেণ্ট-রচিত শিক্ষা-পরিকল্পনা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা সমিতির (Central Board of Education) প্রস্তাবে বয়স্ক-শিক্ষাও জাতীয় শিক্ষার অত্যাবশ্যক সমস্যা বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে এবং তদনুসারে ভারতের সর্বত্রই এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ সুরু হইয়াছে।

মূল অর্থ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রাপ্তবয়স্কগণের শিক্ষা-ব্যবস্থার কয়েকটি বিভিন্ন নামের সহিত আমরা সুপরিচিত। যেমন, ইংলণ্ডে ইহাকে বলা হয় Adult

Education। বিশ্বসংস্কৃতি-সংসদ ইহার নাম দিয়াছেন Fundamental Education। চীন দেশে ইহা Mass Education নামে পরিচিত। আবার ভারত ও রাজ্য গভর্ণমেণ্ট ইহাকেই বলিয়া থাকে Social Education বা সমাজ-শিক্ষা। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার মান বা অগ্রগতির পরিমাপে জনশিক্ষার মানও নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ন্যায় শিক্ষায় অগ্রগামী দেশে বয়স্কশিক্ষা বলিতে প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর পরবর্তী শিক্ষানুশীলনকে বুঝায়। কিন্তু ভারতের ন্যায় শিক্ষায় পশ্চাৎপদ দেশে জনশিক্ষা বা সমাজশিক্ষার প্রধান সমস্যা হইতেছে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ। অবশ্য নিরক্ষরতা-দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিবে সামাজিক ও নাগরিকতা-বিষয়ক নানা জ্ঞান-বিস্তার।

সংক্ষেপে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ—

(১) নিরক্ষর নরনারীকে সাক্ষর করিয়া তোলা।

(২) সদ্যসাক্ষর নরনারীর নবলব্ধ জ্ঞানের স্থায়িত্ব-বিধানের জন্য পরবর্তী শিক্ষা ও অনুশীলনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা-অবলম্বন।

(৩) সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার প্রসার।

এদেশে শিক্ষার ইতিহাস খুব প্রাচীন হইলেও সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জনশিক্ষা বা বয়স্কশিক্ষার প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের নানাবিধ উদ্যমের সহিত আমরা পরিচিত, কিন্তু স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বহির্ভূত বয়স্ক নরনারীর জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন এই নূতন।

এই আন্দোলনের তাৎপর্য ও আশু গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে যে কয়েকটি কথা বিবেচনা করা আবশ্যক, তাহা এই :—

একদল লোক আছেন যাঁহারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, দেশের নিরক্ষরতা-দূরীকরণই যদি জনশিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনই সর্বাগ্রে আবশ্যক। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাই নিরক্ষরতা-সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। অতি সত্য কথা। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ভিন্ন কোন দেশেই নিরক্ষরতা দূরীভূত হয় নাই,—হইতেও পারে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা যত সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপকই হউক না কেন, কেবল মাত্র ইহার প্রসাদেই জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা-কাঠামোর বাহিরেও যে অসংখ্য বয়স্ক নরনারী থাকিয়া যায় তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও অবশ্যস্বীকার্য। জাতীয় সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রকৃত অনুধাবনই যদি জাতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তকের মারফতেই জাতীয় সংস্কৃতির সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটিয়া উঠিতে পারে না। সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা যায় জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধির পটভূমিকায়। অভিজ্ঞতাবিহীন তরুণ-তরুণীর পক্ষে কেবল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই জাতীয় শিক্ষা ও

সংস্কৃতির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। বয়স্কশিক্ষা এই অভাব পূরণ করিতে পারে,—এইখানেই বয়স্কশিক্ষা-ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনীয়তা। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্যার রিচার্ড লিভিংস্টোন বলিতেছেন :—

"Experience of life is necessary for the full and fruitful study of subjects like literature, history, politics and economics. The cultural education of the young is and must be very incomplete when they leave school and even when they have taken a University degree—not from any fault of their own but because they have very little first-hand knowledge of life."

এই কারণেই শিক্ষায় অগ্রসর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রগতিশীল ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশসমূহেও বয়স্কশিক্ষার সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত নানাবিধ ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই ইংলণ্ডে নানাভাবে বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার অনিবার্য সম্পূরক হিসাবে বয়স্কশিক্ষা আজ সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ১৯৪৪ সনের শিক্ষাবিধানে (Education Act) ইংলণ্ডের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইহা স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সনের শিক্ষাবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—.

It is the duty of every Local Education Authority to secure the provision for their area of adequate facilities for adult education :

(a) Full-time and part-time education for persons over compulsory school age ; and

(d) Leisure-time occupation in such organized cultural training and recreative activities as are suited to their requirements, for any persons over compulsory school-age who are able and willing to profit by the facilities provided for that purpose.

যাঁহারা মনে করেন যে, স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা দ্বারাই জাতীয় শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা যায় এবং স্থায়ীভাবে বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন পরিচালনা করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহাদিগকে কানাডার বয়স্কশিক্ষা সংস্থার অধিকর্তা ই. এ. করবেটের (E. A. Corbett) অর্থপূর্ণ উক্তিটি উপহার দিতেছি।

"The school can fix manners but not morals, emphasis but not sense, shibboleths but not philosophy. I do not mean that it is not desirable or useful to supply students at all ages

with sound ideas on ethics, politics, economics, aesthetics. That must be done if they are to have any sense of the values of civilization, national stability and international peace. But the job is not then finished. All we have done is to baptize the children. The real work of conversion and conviction can only be accomplished in mature life. If we neglect the adult in our educational system, we neglect the harvest. We are like a lazy farmer who sows his seed dutifully and hopefully in the spring, but goes off fishing when the harvest is ripe."

দেশের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়া গেলেও যে বয়স্কশিক্ষার আবশ্যকতা নিঃশেষ হইয়া যায় না, উপরোদ্ধৃত উক্তিটি এই মতবাদেরই অকাট্য সমর্থন। উপরন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা যত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারীই হউক না কেন, দেশের নিরক্ষরতা সমস্যার আমূল সমাধান কখনই কেবল মাত্র স্কুল-কলেজের সাহায্যে সম্ভবপর হয় নাই—ইহার স্বপক্ষেও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে নিরক্ষরতা সমস্যা নাই বটে, কিন্তু নিরক্ষর লোক (৬।৭ বৎসরের অধিক বয়স্ক) নাই একথা বলা চলে না। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকবালিকাদের শতকরা অন্ততঃ ৫ জন পরবর্তী অনুশীলনের অভাবে পুনরায় নিরক্ষরের পর্যায়ভুক্ত হইয়া যায়,

তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে লোক-গণনা পরিসংখ্যানে। খালি নিরক্ষরতা দূরীকরণেই বয়স্কশিক্ষা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সীমাবদ্ধ নহে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সফল হইলেই বয়স্কশিক্ষার আবশ্যকতা শেষ হইয়া যায় না। দার্শনিক সি. ই. এম্. জোয়াড (C. E. M. Joad) বলিতেছেন—

"To a man of trained mind and developed tastes, the world becomes literally a larger place, larger and more exciting. He is able to see in it more of beauty, more variety and more scope for his sympathy and understanding. The world is transformed from a humdrum scene of workshop, factory or office to a universe of meaning and mystery and a treasure-house of beauty."

বয়স্কশিক্ষার ইহাই হইল প্রকৃত তাৎপর্য। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বয়স্কশিক্ষার স্থান অবিসম্বাদী।

জনশিক্ষাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। রাষ্ট্রের প্রতিটি নরনারীই সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সজ্ঞান ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে ইহাই গণতন্ত্রের আদর্শ। আত্ম-সচেতন জনসমাজ ব্যতীত গণতন্ত্র একটা নাম মাত্র, ভূয়া ও দলগত কায়েমী স্বার্থে পর্যবসিত হইতে বাধ্য। জনশিক্ষার প্রসাদেই গণতন্ত্র সচল ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।

যে-কোন দেশেই সামাজিক, অর্থ নৈতিক বা রাষ্ট্রীয়

পুনর্গঠন অথবা সংস্কার জনশিক্ষা ব্যতীত কার্যকরী হইতে পারে না। পুনর্গঠন পরিকল্পনার সহিত জনগণের সংযোগ থাকা চাই। জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জনের প্রকৃষ্ট উপায় জনশিক্ষার প্রসার। নচেৎ সমাজসংস্কার, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, শাসন-বিধানের পরিবর্তন ইত্যাদি সব কিছু ব্যাপারেই একতান্ত্রিক নেতৃত্ব অথবা দলীয় প্রভুত্ব আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিয়া থাকে।

গণতন্ত্রকে এবংবিধ দোষ হইতে মুক্ত রাখিতে হইলে জনশিক্ষা-ব্যবস্থাকে অব্যাহত, সর্বজনীন ও অনায়াসলব্ধ করিতে হইবে।

জনশিক্ষাই জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতির বাহক ও ধারক। "Education was the prerogative of the rich, and a grudging gift to the poor."—'শিক্ষায় ধনী সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার। নির্ধনের ভাগ্যে ছিঁটেফোঁটা দান।' এই মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। শিক্ষা জিনিসটাকে মহামূল্য মণি-মাণিক্যের মত সৌভাগ্যবানের গজদন্ত-নির্মিত গম্বুজে সুরক্ষিত করিয়া রাখা আর চলিবে না। শিক্ষার আলো জনসাধারণ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়া চাই। ধনী-নির্ধন সকলেই শিক্ষালাভে সম-অধিকারী। বুর্জোয়া সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতি নহে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ, উদার ও সর্বজনীন।

আমাদের ন্যায় দেশে বয়স্কশিক্ষার আরও একটা আশু আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যাইতেছে। সর্বজনীন প্রাথমিক

শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম প্রতিবন্ধক অশিক্ষিত মাতা-পিতা। যতদিন পর্যন্ত মাতাপিতা শিক্ষার তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিতেছে ততদিন পর্যন্ত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের পথ সুগম ও সহজ হইতে পারে না। শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা যত সহজে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। বালকবালিকাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চাই বয়স্কদের জন্যও শিক্ষার আয়োজন। ইংলণ্ড প্রমুখ দেশে দেখা যায়, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। এদেশের শিক্ষা পুনর্গঠনের যে বহুমুখী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে—তাহাতে বয়স্কশিক্ষার স্থানও সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে।

জনশিক্ষা যুগে যুগে

"জনশিক্ষা" কথাটির দুইটি অর্থ—একটি ব্যাপক আর একটি সঙ্কীর্ণ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষারই আর এক নাম জনশিক্ষা ; অর্থাৎ শিক্ষার প্রসাদ জাতি বা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তরের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নরনারীই সমভাবে লাভ করিবে, কেহই বঞ্চিত রহিবে না। কেবল মুষ্টিমেয় জনকয়েক লোক বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেই শিক্ষালাভের সুযোগগুলি সীমাবদ্ধ থাকিবে না। স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে আপামর জনগণ সকলেই শিক্ষা-ভাগীরথীর পূত-ধারায় অভিসিঞ্চিত হইবে। শিক্ষাসত্রের মহাভোজে কেহই অপাংক্তেয় নহে। শিক্ষার এই সর্বজনীন সংজ্ঞাই জনশিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য। শিক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার—ইহা আজ সর্বজনস্বীকৃত। এই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই জগতের সর্বত্র প্রগতিশীল জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হইতেছে।

কিন্তু এই ব্যাপক বা সর্বজনীন অর্থ ছাড়াও আর একটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে জনশিক্ষা কথাটির ব্যবহার হইতেছে। বর্তমান নিবন্ধে এই অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থবাচক জনশিক্ষার কথাই আলোচিত হইবে। সঙ্কীর্ণার্থক হইলেও জনশিক্ষা আর সর্বজনীন জাতীয় শিক্ষার মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। সঙ্কীর্ণার্থক জনশিক্ষা বৃহত্তর জাতীয় শিক্ষারই অপরিহার্য সম্পূরক। জাতিসংঘের সংস্কৃতি-সংসদ হিসাব করিয়া

দেখিয়াছেন যে, সারা দুনিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত। বিস্তীর্ণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ লোকেরই সাধারণ জীবনযাত্রার মান্ অতীব নিম্নস্তরের। এই বিরাট মানবগোষ্ঠীর অবস্থার সমন্নোয়ন ব্যতীত বিশ্বমৈত্রী ও আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রচেষ্টা সফল হইবার নহে। পৃথিবীব্যাপী অশিক্ষার বিরুদ্ধে যে অভিযান আজ বিশ্ব-সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক রচিত হইয়াছে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে দেশ, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নরনারীর প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন।

এই শিক্ষা-পরিকল্পনা (Fundamental Education Programme) অনেকাংশেই সঙ্কীর্ণার্থক জনশিক্ষার অনুরূপ। প্রত্যেক দেশ ও রাষ্ট্রেই সাধারণতঃ শিক্ষা বলিতে আমরা একটা নির্দিষ্ট বয়ঃক্রমের বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর শিক্ষাব্যবস্থাকেই বুঝিয়া থাকি। স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ যাহারা পায় তাহাদের ছাড়াও একটা বড় সংখ্যক নরনারী সব দেশেই থাকে। শিক্ষার সুযোগলাভে বঞ্চিত এই জনসমাজ প্রায় সর্বত্রই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বারো বা চৌদ্দ বৎসর এবং তদূর্ধ্ব বয়স্ক নরনারীর জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। ইহাই জনশিক্ষার সঙ্কীর্ণ অর্থ।

প্রাচীন যুগ

পাঁচ বা ছয় হাজার বৎসর পূর্বেও এই সুপ্রাচীন ভারত-ভূমিতে যে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল সেই আলোকের দূরাগত ক্ষীণ রশ্মিরেখায় তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার অস্তিত্বের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিভাত হয়। মোহেঞ্জো-দারো এবং হরপ্পার সমাজেও যে লেখাপড়ার চল ছিল তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ আছে—সেকালের পোড়া মাটির পাত্রে এবং উৎকীর্ণ লিপিমালায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি সেই লিপির রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। তৎকালীন প্রচলিত লেখাপড়া কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিংবা জনসাধারণের মধ্যেও বহুল প্রচলিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত আদৌ সম্ভবপর নহে। দ্রাবিড় যুগ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যাইতে পারে।

পরবর্তী আর্য-যুগের যে তথ্য আজ আমরা পাই তাহাতে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিতে পারা যায়। আর্য ঋষিগণ বেদের স্রষ্টা। স্মৃতি ও শ্রুতির মাধ্যমে যুগে যুগে আহরিত জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্ভার বংশপরম্পরায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। সেই অতুল্য জ্ঞানামৃতের অপূর্ব আস্বাদনে আজও পর্যন্ত বিশ্ববাসী মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত।

আর্য ঋষিগণ জগৎকে যে জ্ঞানবিজ্ঞান উপহার দিয়াছেন তাহার শাশ্বত মহিমার অম্লান দ্যুতিতে ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য-দীপ্ত, সমুজ্জ্বল। সেই প্রায়-বিস্মৃত অতীত যুগে

কিভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের এতদূর পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক সুচিন্তিত ও সুসংবদ্ধ প্রণালীতেই যে আর্য-সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইত সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রাচীন গ্রন্থ ও ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া ইহার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জনশিক্ষা সম্বন্ধে একটি সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল কি না তাহা লইয়া তর্ক উত্থাপন করিয়া লাভ নাই। মানুষ মাত্রেই কোন-না-কোন অতীত ঐতিহ্যের অধিকারী। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং নবলব্ধ অভিজ্ঞতার ক্রমসমন্বয়েই মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মণিকুট্টিম সতত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কাল হইতেই জীবিকার্জনের পাথেয় এবং সেই সঙ্গে অতীত ঐতিহ্যের সহিত পরিচয়-সাধনই শিক্ষার আদর্শ বা লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আর্য-যুগের শিক্ষাদর্শের ভিতর দিয়াও এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্যসমাজ চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। পরাভূত আদিবাসীরা আর্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া শূদ্র আখ্যা পাইল। আর্যগণের সেবা ও পরিচর্যাই হইল ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। প্রথমোক্ত বর্ণত্রয়ের মধ্যেই তৎ-কালীন শিক্ষাব্যবস্থার আবশ্যিক প্রচলন দেখা যায়। আর্য-সমাজে ধর্মের প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যাবতীয় আচরণ, ক্রিয়া-কর্ম সবই ছিল ধর্মানুগ। আর্যসমাজের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল ধর্মনিয়ন্ত্রিত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তথাকথিত তিন বর্ণের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে উপনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথানুযায়ী প্রত্যেক বালকবালিকাকেই বাল্য ও কৈশোরের একটা নির্দিষ্ট অংশ বিদ্যার্জনে অতিবাহিত করিতে হইত। গুরুগৃহে যে শিক্ষা ইহারা অর্জন করিত তাহা আংশিক তত্ত্বমূলক বা academic এবং আংশিক বৃত্তিমূলক বা vocational. সাধারণভাবে শূদ্রগণ আর্যশিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত না হইলেও বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত না। স্বয়ং বেদব্যাস শূদ্রী মাতার সন্তান ছিলেন। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে খুব সম্ভব লিখিবার কৌশল বা লিপিমালা উদ্ভাবিত হয় নাই। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা সবই ছিল মৌখিক। লিপিমালার উদ্ভাবন ও ব্যবহার হইয়াছিল অনেক পরে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয় আর্যসমাজে লিখনের ব্যবহার হইতে দেখা যায় এবং এই সময়ে সাক্ষর ও শিক্ষিতের হার শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

শাস্ত্রালোচনার অঙ্গরূপে আক্ষরিক শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হইত। কিন্তু কালক্রমে ত্রৈবর্ণিকের আক্ষরিক শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পাইতে থাকে। বৈদিক উপনয়ন এবং সংস্কার সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহ ক্রমশঃই এত জটিল এবং বাহুল্য-সঙ্কুল হইয়া পড়িতে থাকে যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সকল অনুষ্ঠান প্রতিপালন করা

প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হয়। ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণীয় লোকের পক্ষে নানা কারণেই সুদীর্ঘ ১২ বৎসর কাল গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন ও বিদ্যাভ্যাস করা ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হইল। অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়সমূহ উপনয়ন প্রথা বর্জন না করিলেও নামেমাত্র উহা বজায় রাখিল। ক্রমশঃ শিক্ষা-অনুশীলনের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। শিক্ষিতের হারও হ্রাস পাইল। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে আক্ষরিক শিক্ষার যে সর্বজনীন ও ব্যাপক প্রসার দেখা গিয়াছিল তাহা ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আক্ষরিক শিক্ষার এই অধোগতির প্রতি তৎকালীন চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ সমাজ বহুলাংশেই একটা ঔদাসীন্যের ভাব প্রদর্শন করিলেন। বর্তমানের ন্যায় তৎকালে আক্ষরিক শিক্ষার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাও এত অধিক অনুভূত হইত না। কাগজের প্রচলন হয় নাই। ছাপাখানার কথা ছিল স্বপ্নের অগোচর। ভূর্জপত্রে লিখিত মসীলিপির স্থায়িত্ব ছিল স্বভাবতঃই অনিশ্চিত ও স্বল্পায়ু। কাজেই আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি লিপিকৌশলের সাহায্যে তাহার অর্জিত জ্ঞানরাশিকে দশজনের কাজে লাগাইবার বেশী সুযোগ পাইত না। কিন্তু সাধারণ সাক্ষরের সংখ্যা অধিক না হইলেও দেশে শিক্ষার অভাব ছিল একথা বলা চলে না। স্মৃতি ও শ্রুতি, ধর্মানুষ্ঠান, লোকাচার, লোকগীতি, আমোদ-প্রমোদ এবং সামাজিক সংযোগ বা সম্মেলন প্রভৃতি বহুপ্রকার লোকশিক্ষার মাধ্যম ছিল সক্রিয় ও সচল। আক্ষরিক শিক্ষা বা literacy-র বহুল প্রসার না থাকিলেও

অন্যান্য বহুপ্রকার জনপ্রিয় মাধ্যম জনশিক্ষার প্রকৃত বাহনরূপে ব্যবহৃত হইত। ভারতের অমর মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের বাণী অনাদিকাল হইতে ভারতের জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ প্রচার করিয়া আসিতেছে। সঙ্গীতে, অভিনয়ে, চিত্রে ও সাহিত্যে বহু বিচিত্র উপায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষা ভারতবাসীর জীবনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। আবার বহু প্রাচীনকাল হইতেই পল্লী-কেন্দ্রিক ভারতীয় জীবনের উপর গ্রাম্য কথকগণের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে এই কথকগণই প্রাচীন পল্লীভারতের জনশিক্ষক ছিলেন।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্মের আমূল রূপান্তর ঘটিতে থাকে। গুণকর্ম-বিভাগ উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথা সৃষ্ট হয়। তখনও দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিজীবীরা কৈশোর এবং বাল্যে কোন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির অধীনে থাকিয়া নিজ নিজ বৃত্তি বিষয়ে শিক্ষা (apprenticeship) লাভ করিত। এই বৃত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য মুখ্যত জীবিকার্জন হইলেও ইহারই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে আক্ষরিক শিক্ষা, সঙ্গীত এবং জ্যোতিষের চর্চাও হইত।

বৌদ্ধযুগে লোকশিক্ষা

বিকৃত বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক আচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মানুষের মানস বিবর্তনের ইতিহাসে এইরূপ একটা প্রচণ্ড বিপ্লব খুব সচরাচর ঘটে নাই। বুদ্ধদেব তাঁহার অহিংসা এবং বেদবিরোধী বাণী জনগণের মধ্যে বহুল প্রচার করিবার উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পল্লী বা প্রাকৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুদ্ধের প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে রাজর্ষি অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম জগতের অন্যতম সর্বাধিক প্রচারিত ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত হয়। প্রাকৃত বা পালি ভাষায় এক বিরাট জনসাহিত্য গড়িয়া উঠে। শিক্ষাকে সর্বজনীন ও সহজলভ্য করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজ অশোক যে সকল অভিনব পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শিলালিপি উৎকিরণ, শিলা-স্তম্ভ স্থাপন, দেশে-বিদেশে প্রচারক প্রেরণ, বিহার প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামে গ্রামে শিক্ষার কার্যে বৌদ্ধশ্রবণ নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে সমগ্র দেশব্যাপী জনশিক্ষা প্রসারের এত বিরাট এবং শক্তিশালী অভিযান তৎকালে এবং তৎপরবর্তী যুগেও প্রায় দেখা যায় না। সম্রাট অশোকের অভিযানের ফলাফল পাওয়া যায় আরও পরে। ভারতের বিখ্যাত বিহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি—নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী, পাহাড়পুর, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলি বৌদ্ধযুগীয় জনশিক্ষা আন্দোলনের গৌরবময় পরিণতি।

মধ্যযুগ

বৈদেশিক আক্রমণে খ্রীষ্টীয় দশম শতকে ভারতের যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়া গেল তাহার ফলাফল কেবল রাজনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল, এইরূপ ভাবিলে ভুল করা হইবে। ধর্মোন্মত্ত বৈদেশিক আক্রমণকারী ভারতের মর্মস্থলে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল, যাহার উদ্দেশ্য ছিল বিজিত জাতিকে হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত করিয়া তাহার জাতীয় ও আধ্যাত্মিক সত্বার বিলোপসাধন করা। মুসলমান যুগের ইতিহাসে ব্যাপক জনশিক্ষা প্রসারের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। সত্য বটে মধ্যযুগীয় ধর্মসাধকগণের সাধনার ফলে জনগণচিত্তে একটি মিলন, সমন্বয় ও সহনশীলতার সুর মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিত; কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অধিকাংশই (আকবর, হুসেন শাহ প্রভৃতি জনকয় স্মরণীয় ব্যক্তি ব্যতীত) ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে উদাসীন অথবা বিরূপ। রাজধানী এবং নবাব-বাদশার দরবারের সান্নিধ্যে মক্তব-মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু গড়িয়া উঠিত। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় জনকয়েক লোকের প্রয়োজন মিটাইতেই নিযুক্ত থাকিত, দেশের অগণিত আপামর জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বলিলেই চলে।

আধুনিক যুগের কথা

ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেই ভারত-ইতিহাসের আধুনিক যুগের সূত্রপাত। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমাংশে তদানীন্তন

গভর্ণর জেনারেলের আদেশক্রমে জন অ্যাডাম বাংলাদেশের একটি শিক্ষা-সার্ভে পরিচালনা করিয়াছিলেন। অ্যাডাম-কৃত রিপোর্টখানি এদেশীয় শিক্ষার ইতিহাসে একখানি মূল্যবান্ দলিল। এই রিপোর্ট দৃষ্টে মনে হয় যে, সেই সময়ে এক বাংলা দেশেই প্রায় লক্ষাধিক পাঠশালা বর্তমান ছিল। এই পাঠশালাগুলি যে আজকালের স্কুলবোর্ড-পরিচালিত প্রাইমারী স্কুলের অনুরূপ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। বর্তমানের গতশ্রী, মুমূর্ষু গ্রামগুলির সহিত তৎকালের সজীব প্রাণ-চঞ্চল এবং সমৃদ্ধিশালী পল্লীর কতই-না প্রভেদ! সেকালের প্রত্যেকটি পল্লীই ছিল আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়া প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাঠশালাগুলিই ছিল পল্লীর শিক্ষাসংস্থা। স্বল্প-পরিসরের মধ্যে এই পাঠশালাগুলিই জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিত। ইহা ছাড়া পল্লীগীতি, পল্লীগাথা, পল্লীসাহিত্য ইত্যাদির মারফৎ জনশিক্ষা বিপুল প্রসার লাভ করিত। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে এবং শাসকবৃন্দের ঔদাসীন্যের ফলে জাতীয় শিক্ষার এই স্বতঃস্ফূর্ত ধারাটি ক্ষীণস্রোতা ও মৃতপ্রায় হইয়া যায়। দুইশত বৎসরের ইংরাজ-শাসনের পর শিক্ষিত বা সাক্ষরের হার শতকরা নামমাত্র ২৪।২৫ সংখ্যায় দাঁড়াইয়াছে—ইহাই সেই শোচনীয় পরিস্থিতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজ সেই অ্যাডাম-বর্ণিত লক্ষাধিক পাঠশালার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া কয়েক হাজারে দাঁড়াইয়াছে। লোকগীতি, লোকগাথা, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, কবিগান প্রভৃতি জনশিক্ষার

চিরাচরিত মাধ্যমগুলিও আজ দুর্দশাগ্রস্ত ও বিলুপ্তপ্রায়। দীর্ঘ ইংরাজ-শাসনের কালে শিক্ষাবিস্তারের জন্য মাঝে মাঝে শাসনকার্যের তাগাদা মাফিক কিছু কিছু লোক-দেখানো ব্যবস্থা করা হইলেও দেশব্যাপী অশিক্ষা দূরীকরণের কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৯৩৭ সনে প্রথম জন-শিক্ষা আন্দোলনের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে একটা দেশব্যাপী সচেতনতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিহার, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশে নিরক্ষরতা-উৎসাদন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যদিও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অবস্থার বিপর্যয়ে সেই আন্দোলন দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ১৯৩৭ সনের হুজুগের ঢেউ বাংলাদেশেও পৌঁছিয়াছিল। সেই সময়ে অবিভক্ত বাংলা দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল মুস্লিম লীগ নামক সাম্প্রদায়িক দল। মুস্লিম লীগের রাজনৈতিক মতবাদ, নীতি ও কর্মপন্থা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, তবু এইটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে জাতি ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ কোন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-আন্দোলন পরিকল্পনা ও পরিচালনা করিবার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব ও শক্তি মুস্লিম লীগের ছিল না। ১৯৩৭ সনে বাংলা দেশের মুস্লিম লীগ গভর্ণমেণ্ট যে জনশিক্ষা কমিটি নিযুক্ত করেন এবং অনেকগুলি অধিবেশনের পর সেই কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করেন সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কোন কার্য হওয়া দূরের কথা, সেই রিপোর্টখানা পর্যন্ত সাধারণে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় নাই—সরকারী

দপ্তরখানার ধূলি-ধূসর র‍্যাক বা তাকেই উহা সদ্‌গতি লাভ করিয়াছে। এই রিপোর্টে মুখ্যত নিরক্ষরতা সমস্যার কথাই বিবেচিত ও আলোচিত হইয়াছে। যে বৃহত্তর অর্থে আজকাল জনশিক্ষা শব্দটি ব্যবহৃত হয় সে-সম্বন্ধে রিপোর্টটি সম্পূর্ণ নীরব। সাময়িকভাবে পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Jute Regulation Dept.) কর্তৃক নিরক্ষরতা- নিবারণ অভিযানও কিছুদিন পরিচালিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অনেকটা যুদ্ধপ্রচারের তাগিদে তৎসময়কার গভর্ণমেণ্ট জাতীয় যুদ্ধফ্রণ্ট নামক এক অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জনশিক্ষা বা নিরক্ষরতা দূরীকরণে মনঃসংযোগ করেন। সেই সময়ে বঙ্গীয় বয়স্কশিক্ষা সংসদ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠান (Bengal Adult Education Association) জাতীয় যুদ্ধফ্রণ্টের সহযোগিতায় জনশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যেমন, রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতন পল্লীউন্নয়ন বিভাগ এবং লেডী অবলা বসু পরিচালিত নারীশিক্ষা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পূর্ব হইতেই সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশা না রাখিয়াই জনশিক্ষা প্রসারে নিযুক্ত ছিল। স্বল্প ও সীমাবদ্ধ হইলেও এই স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান সামান্য নহে।

১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য গভর্ণমেণ্ট প্রথমে দেশব্যাপী জনশিক্ষা আন্দোলন পরিচালনা করিবার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট

১৯৪৮-৪৯ সনের শিক্ষাবাজেটে পাঁচলক্ষ টাকা জনশিক্ষা বাবদ বরাদ্দ করেন, এবং ওই বৎসরেই খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে সভাপতি এবং লেখককে সম্পাদক করিয়া এক বয়স্ক-শিক্ষা কমিটি নিযুক্ত করেন। সুদীর্ঘ আলোচনা ও বিবেচনার পর এই কমিটি গভর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহার মূল সুপারিশগুলির ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষা বা সমাজশিক্ষার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এখন সেই পরিকল্পনা অনুসারেই জনশিক্ষার কাজ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে।

এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ঃ—

(১) নিরক্ষর বয়স্ক নরনারীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

(২) সদ্যলব্ধ অক্ষরপরিচয়ের স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতি বিধান।

(৩) সর্বসাধারণের জন্য সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা-প্রসারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন।

বড়দের লেখাপড়া

দেশজোড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনশিক্ষার প্রসারকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশের নানা জেলায় জনশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যে অভিযান শুরু করিয়াছেন তাহার প্রাথমিক ফলাফল জানিবার জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই আগ্রহান্বিত। সরকার-প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র ছাড়াও নানা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে বহু কেন্দ্র নানা স্থানে জনশিক্ষার কাজে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মোট প্রায় ৩০০০ হাজার কেন্দ্র নানা স্থানে কাজ করিতেছে। আপাততঃ লিটারেসি বা আক্ষরিক শিক্ষা দেওয়াই এই সব কেন্দ্রের প্রধান কাজ। অনুমান করা হইয়াছে যে, তিন হইতে চার মাসের প্রযত্নে একজন নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়া সাধারণভাবে পড়িতে ও লিখিতে সক্ষম হইতে পারে। প্রতি কেন্দ্রে গড়ে কুড়িজন পুরুষ বা নারী শিক্ষার্থী যোগদান করিয়া থাকিলে তিন হাজার কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনকল্পে ষাট হাজার বলিয়া ধরা যায়। পরিসংখ্যান বা স্টাটিস্টিক্সের দিক দিয়া সংখ্যাটি নেহাৎ তুচ্ছ নহে। এই হারে যদি প্রতি তিন মাসে আমাদের দেশের নিরক্ষর নরনারীর আক্ষরিক শিক্ষা সমাপ্ত হইতে থাকে তাহা হইলে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ লোক সাক্ষর হইতে পারিবে। সমস্যার গুরুত্বের তুলনায় অগ্রগতি খুব সন্তোষজনক না হইলেও একেবারে অগ্রাহ্য করিবার মতো নহে। কেবলমাত্র

জনশিক্ষা কেন্দ্রের সাহায্যেই দেশের বিরাট নিরক্ষরতা সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব নয়। সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নিরক্ষরতা সমস্যার আমূল বিলোপসাধন হইতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষা জনশিক্ষা অভিযানের দ্বৈরথ। যদি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষার কাজ যুগপৎ চলিতে থাকে তাহা হইলে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশের নিরক্ষরতা সমস্যার বিলোপ ঘটিবে।

প্রতি বৎসরে যদি দুই লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক লোক সাক্ষর হইতে থাকে এবং যদি পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের সদ্যলব্ধ বিদ্যাটুকুর স্থায়িত্ববিধান করা যায়, তবে এই প্রচেষ্টাকে একটা ব্যাপক আন্দোলনের শুভ প্রারম্ভ বলিয়া অভিনন্দিত করা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। পরিসংখ্যানের একটা আপাত মোহিনী শক্তি আছে। হাজার বা লাখ এই উচ্চ সংখ্যাগুলিকে কৌশলে সাধারণ লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া অতি সহজেই তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়। কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স্ বা সংখ্যাবিজ্ঞানের রহস্যের অন্তরালে প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে কতকগুলি হিসাবের ফাঁকি। বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিত আপাত সুন্দর স্ট্যাটিস্টিক্সের নগ্ন, রিক্ত মূর্তি প্রকট হইয়া উঠে। এক্ষেত্রেও যে বলা হইয়াছে প্রতি বৎসর গড়ে দুই লক্ষ নিরক্ষর বয়স্ক নরনারী অক্ষরজ্ঞান লাভ করিতে থাকিবে তাহাতেও সেই স্ট্যাটি-স্টিক্সের ফাঁকি কিছুটা রহিয়া গিয়াছে।

কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হইবার পর একাধিক জায়গা হইতেই একটা অভিযোগ আসিতেছে এই যে, কেন্দ্রগুলি খুলিবার সময় জনসাধারণের মনে খুব উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখা গিয়াছিল এবং প্রথম প্রথম বহু পুরুষ ও নারী কেন্দ্রগুলিতে যোগদান করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন বাদেই দেখা গেল যে জনসাধারণের আগ্রহ তেমন আর নাই এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। প্রথম ছয় মাস পরেই দেখা গেল যে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়া গিয়া প্রায় অর্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। এ অভিযোগ ভিত্তিহীন তো নহেই বরং কতকগুলি বিশেষ কারণে স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত। এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থার প্রতিবিধান কি ?

শিশুশিক্ষার ন্যায় বয়স্কদের শিক্ষাদান বিষয়টিও মূলতঃই মনস্তত্ত্বমূলক। শিশুশিক্ষায় যেমন শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, শিশুর মনের গতি, শিশুর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ ও প্রভাব ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, বয়স্কদের বেলাতেও শিক্ষার্থীর মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া তাহার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিধেয়। একজন সংসারী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির শিক্ষাব্যবস্থায় এই কথাটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে-শিক্ষা তাহাকে দেওয়া হইতেছে—সেটা তাহার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের সহিত সম্পর্কিত কিনা। বাস্তবের সহিত সম্পর্কবিহীন যে-কোন শিক্ষাই তাহার কাছে নিরর্থক ও মূল্যহীন। পরিণতবুদ্ধিসম্পন্ন ও সংসারাভিজ্ঞ

বয়স্ক ব্যক্তি প্রথমেই বিচার করিয়া দেখিবে যে, শিক্ষার সাহায্যে তাহার কি প্রত্যক্ষ উপকার সাধিত হইতেছে বা হইতে পারে। যেমন, একজন বয়স্ক গ্রাম্য চাষীকে অক্ষর-পরিচয় করাইতে গেলেই সে ভাবিবে যে, অ-আ-ক-খ শিখিয়া তাহার লাভ কি? ইহাতে কি তাহার রোজগারের পরিমাণ বাড়িবে, না চাষবাসের চাইতে অধিক লাভজনক অন্য কোন কাজ জুটিবে? অক্ষরপরিচয় দ্বারা তাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিবে এই কথাটা পরিষ্কারভাবে তাহাকে বুঝাইতে না পারিলে তাহাকে এই কাজে ভিড়াইতে পারা যাইবে না। প্রথম প্রথম দু'চার-ছয় দিন হয়তো একটা কৌতূহল বা উৎসাহের বশে বা কাহারও অনুকরণে লেখাপড়ার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু সে-উৎসাহ বেশিদিন স্থায়ী হইবে না। লেখাপড়ার কাজে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিতে হইলে প্রথমে তাহার পক্ষে প্রকৃতই আনন্দময় এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে এবং লেখাপড়া শেখাটা যে তাহার প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনেই অপরিহার্য এই কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক— সুদখোর গ্রাম্য মহাজনের খপ্পরে পড়িয়া ঋণগ্রস্ত নিরক্ষর চাষীর দুর্দশার কথা সর্বজনবিদিত। পঞ্চাশ টাকা কর্জ নিয়া পাঁচশত টাকা ঋণের দায়ে বেচারী চাষীর ধানী জমি, হালের গরু মায় বাস্তুভিটাও ক্রমশঃ কি ভাবে মহাজনের কুক্ষিগত হয় —এ ঘটনা বাংলা দেশের পল্লীসমাজে অহরহঃই দেখা যায়।

নিরক্ষরের জীবন নানাভাবেই বিড়ম্বিত। প্রবাসী আত্মীয়ের

একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি পড়াইতে হইলেও পাঁচজনের তোসামোদ করিয়া বেড়ান, কোন দলিলপত্রে নাম স্বাক্ষরের পরিবর্তে টিপসই দেওয়া, না বুঝিয়া এক শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া রেলে আর এক শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া টিকিট-কালেক্টারের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়া—এবংবিধ লাঞ্ছনা ও অপমানভোগ নিরক্ষর ব্যক্তির জীবনে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। লিখিতে ও পড়িতে জানাটা যে নিত্য আহার-নিদ্রার মতোই প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য—একথাটা প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত দিয়াই নিরক্ষর ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়। বর্তমান প্রগতির যুগে লেখাপড়া শেখার মূল্য প্রায় সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে। অজ পাড়াগাঁয়ের চাষী-মজুররাও একথাটা বুঝে যে লেখাপড়া না জানাটাই তার আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক পদমর্যাদা লাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে সেও হয়তো অন্য পাঁচজন লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারিত।

নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিকে যদি তার নিজ গরজে লেখাপড়ার কাজে ভিড়ান যায় তবেই জনশিক্ষা প্রচেষ্টার সাফল্য সুনিশ্চিত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে motivation বা গরজ—বয়স্ক শিক্ষায় ইহা একটা খুব বড় কথা। বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ-ভাবে কিছু শিখাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহার ভিতরেই শিখিবার একটা প্রবল গরজ বা আগ্রহ সৃষ্টি করাই হইবে বয়স্কশিক্ষার মূলমন্ত্র। অর্থাৎ 'এটা শেখ, ওটা শেখ' একথা

না বলিয়া শিক্ষার্থীর মুখ দিয়াই 'এটা শিখব, ওটা শিখব', একথা বলাইতে হইবে। বয়স্ক ব্যক্তি যতক্ষণ না নিজের গরজে কিছু শিখিতে চাহিবে ততক্ষণ পর্যন্ত বয়স্কশিক্ষার প্রচেষ্টা পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

ভারতীয় সৈন্যদলে নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সৈনিক মাত্রকেই লেখাপড়া শিখিতে হইবে, নতুবা চাকরীতে স্থায়ীভাবে বহাল হওয়া, বেতন-বৃদ্ধি, বা পদন্নোতি কিছুই হইতে পারিবে না। কাজেই চাক্‌রীর দায়েই প্রত্যেক সৈন্যকে লেখাপড়া শিখিতে আগ্রহশীল হইতে হয়। এই হইতেছে তাহার motivation।

কিছুদিন আগে হায়দরাবাদের একটা বয়স্কশিক্ষা-কেন্দ্র পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কেন্দ্রের কাজ হইতেছিল রাত্রিতে। বিশ-পঁচিশ জন চাষীশ্রেণীর লোক আরবী বর্ণমালা লেখা শিখিতেছিল। শিক্ষার্থীদের একজন ছাড়া আর সবার বয়স হইবে ২৫ হইতে ৪০-এর মধ্যে। কিন্তু বাকী একজনের বয়স হইবে সত্তরেরও বেশী। চোখে চশমা আঁটিয়া বুড়ো মানুষটি শ্লেটে আরবী অক্ষরগুলি লিখিতেছিল। তার হাবভাবে মনে হইল, এতখানি বয়সে লোকটা লেখাপড়ার কাজে নূতন ব্রতী হইলেও বাস্তবিকই আগ্রহশীল। একটু কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া দোভাষীর মারফত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বৃদ্ধবয়সে তাহার পক্ষে লেখাপড়া শিখিতে আসার হেতু কি, প্রয়োজনই বা কি ? তাহার উত্তর হইল এই যে, পবিত্র কোরান শরিফ পড়িতে না পারাটা

স্বর্গলাভ বা বেহেস্তে যাওয়ার পক্ষে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। ইহা তাহার বদ্ধমূল বিশ্বাস। জীবনে লেখাপড়া শিখিবার কোন সুযোগই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই,—আজ যদি এমন সুযোগ পাওয়া গিয়াছে সে-সুযোগ সে হেলায় নষ্ট করিতে প্রস্তুত নয়। বেহেস্তে তাহাকে যাইতেই হইবে।

প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির বেলাতেই motivation বা গরজের সুযোগ লইতে হইবে। মনোবিজ্ঞানের মতে বয়স্কশিক্ষা বিষয়টি হইতেছে প্রধানতঃ individualistic বা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-সাপেক্ষ। প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও চাহিদা কি তাহা ভালরকম জানিয়া সেই চাহিদা মিটাইবার জন্যই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেইজন্যই বয়স্কশিক্ষায় একসঙ্গে বহুলোকের শিক্ষাদান অসুবিধাজনক। তবে বহু ক্ষেত্রেই একই সম্প্রদায় বা একই পেশার লোকের চাহিদা একই প্রকারের হইতে পারে সেকথা স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে largest common factor আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় গুরুমহাশয়গিরি করা চলে, কিন্তু বয়স্কদের বেলায় তাহা একান্তই অচল! বয়স্ক ব্যক্তিকে কিছু শিখাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহার মনে শিখিবার গরজ বা আগ্রহ জাগাইয়া তোলাই মনস্তত্ত্বসম্মত প্রকৃত পন্থা। যদি এই মনস্তত্ত্বসম্মত প্রণালীতে বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্রগুলির কাজ পরিচালনা করা যায় তাহা হইলে জনসাধারণের ঔদাসীন্য বা আগ্রহের অভাব ঘটিবার কোন কারণ নাই। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বরঞ্চ

তাহার বিপরীত ফলই আশা করা যাইতে পারে। অনেক স্থলে প্রথমেই লিটারেসি বা বর্ণশিক্ষার কাজ শুরু না করাই উচিত। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এমন সব অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক আছে যাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী ক্রমবিবর্তনশীল সভ্যতার সংস্পর্শে এতটুকু পরিবর্তিত হয় নাই। এই সব শ্রেণীর লোকেরা আজও পর্যন্ত দুর্গম অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রকৃতির কোলে তাহাদের আদিম বন্য জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এই শ্রেণীর লোকের কাছে, লেখাপড়া শিখার কোন মূল্যই নাই, এবং তাহাদের বেলায় প্রথমেই অক্ষর পরিচয়ের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রসারের প্রচেষ্টা হইবে সম্পূর্ণ বিফল। নিতান্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও অনেক সময়েই দেখা যায় যে, সাধারণ বয়স্ক মেয়েপুরুষকে প্রথমেই অক্ষর চিনাইয়া লেখা-পড়ার কাজে আগ্রহান্বিত করা কষ্টকর। সরাসরি লিটারেসি শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ, আলাপ-আলোচনা, চলচ্চিত্র, বেতারবার্তা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া শিক্ষার্থীর মনের জড়তা নষ্ট করিয়া শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লওয়া বিধেয়। বয়স্কশিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষক অনেক সময়েই সনাতন পদ্ধতিতে অ-আ-ক-খ শিখাইবার প্রয়াস করিয়া শিক্ষার্থীর দিক হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাড়া না পাইয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়েন। শিক্ষার্থীর কি প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থী কি জানিতে চায়,—তাহাই হইতেছে বয়স্ক-শিক্ষার মূল সূত্র; শিক্ষক কি জানেন বা শিক্ষক কি বলিতে চান সে-কথার গুরুত্ব হইতেছে গৌণ।

পাঠ ও পদ্ধতি

বয়স্কশিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিতে হইলে বয়স্কদের কি কি বিষয় শিখাইতে হইবে এবং কি প্রণালীতে পাঠদান করা বিধেয় তাহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ বয়স্কশিক্ষা কমিটি এবং অন্যান্য অনেকেই বয়স্কশিক্ষার জন্য যে-সকল সিলেবাস রচনা করিয়াছেন তাহাতে খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু তারতম্য থাকিলেও মূল বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল পরিলক্ষিত হয়। বয়স্কশিক্ষা সিলেবাসটিকে সকলেই তুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,—

(১) Literacy, বা আক্ষরিক জ্ঞান।

(২) Further Education বা পরবর্তী শিক্ষা।

Literacy বা আক্ষরিক জ্ঞান জন্মাইবার জন্য যেটুকু শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত তাহা মোটামুটি এই,—

(ক) মাতৃভাষায় অক্ষর পরিচয় এবং সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত বই বা খবরের কাগজ পড়িতে এবং পঠিত বিষয় লিখিতে পারা।

(খ) অক্ষর পরিচয় এবং পড়িতে ও লিখিতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক পাটীগণিতে পাঠদান। পাটীগণিত বা অঙ্কের সাধারণ জ্ঞান ছাড়া literacy বা সাক্ষরতা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। বয়স্কশিক্ষার এই প্রথম অংশটি মোটামুটি সন্তোষজনক ভাবে পরিসমাপ্ত

করিতে হইলে অন্ততঃ তিন মাস সময়ের প্রয়োজন। তিন মাসের অধিক সময় পাইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু বয়স্কদের বেলায় তিন মাসের অধিক সময় নানা অনিবার্য কারণে পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তিন মাসের মেয়াদেই বয়স্কদিগকে সাক্ষর করিয়া তুলিতে হইবে। এবং সেই অনুযায়ী একটি পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস এবং দৈনন্দিন কার্যের রুটিন বা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞান (literacy) জন্মিবার পর যাহাতে সেই নবলব্ধ জ্ঞান চর্চাভাবে নষ্ট না হইয়া যায় এবং 'পরবর্তী শিক্ষা' দ্বারা উহা উত্তরোত্তর বিকাশলাভ করিতে পারে, সেজন্য আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয়ের অনুশীলন আবশ্যক। যথা,—

[ক] ইতিহাস।

[খ] ভূগোল।

[গ] পৌরশাসনবিধি ও দেশের শাসনতন্ত্র।

[ঘ] স্বাস্থ্যবিদ্যা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।
[স্ত্রীলোকদের জন্য প্রসূতিপরিচর্যা ও শিশুপালন]

[ঙ] সাধারণ বিজ্ঞান।

[চ] সঙ্গীত, লোকনৃত্য, অভিনয়, কবিগান, কথকতা, কীর্তন ইত্যাদি আনন্দানুষ্ঠান।

[ছ] কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

এই তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির পরিশীলন যে সকল অবস্থাতেই একটা নির্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ

রাখিতে হইবে, তাহা নহে। বরং অবস্থাবিশেষে বিষয় ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তন আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু মোট কথা এই যে, দেশের ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যা ও পৌরশাসনবিধি ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় বয়স্কশিক্ষার অপরিহার্য উপজীব্য। কাজেই পরবর্তী শিক্ষার জন্য এই বিষয় কয়েকটিকে তালিকাভুক্ত রাখিতেই হইবে। মাতৃভাষা বা ব্যবহারিক অঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিষয়েরও কিছু কিছু চর্চার ব্যবস্থা রাখা উচিত, কারণ তাহা হইলে কেবল যে লেখাপড়ার একঘেয়েমিই দূর হইবে তাহা নহে, পরন্তু অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইবে এবং পরবর্তী শিক্ষার পথ সহজ ও সুগম হইবে। মাতৃভাষা ও অঙ্কের ন্যায় এই সব বিষয়ে কোন নিয়মিত পাঠদানের (formal instruction) প্রয়োজন নাই।

আলাপ, আলোচনা এবং সম্ভব স্থলে হাতেকলমে কাজ, ছবি ও চার্ট, ম্যাজিক লণ্ঠন বা চলচ্চিত্র ও লোকনাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে এই সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সহজ।

দৈনন্দিন রুটিন

প্রথম তিন মাস কাল আক্ষরিক জ্ঞান অর্জনের কাজেই অতিবাহিত হইবে। আক্ষরিক জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য বিষয়ের কিছু আলোচনাও চলিবে এবং আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কার্যকলাপ সজীব ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে।

তিন মাস সময়ে সপ্তাহে ছয়দিনের প্রতিদিন গড়ে ২ ঘণ্টা করিয়া বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রের কাজ চালাইতে গেলে অন্ততঃ ১৫০ ঘণ্টা পাইবার কথা। কিন্তু সাপ্তাহিক অবকাশ ও অন্যান্য অনিবার্য বাধা-বিঘ্নের কথা ধরিয়া লইলে মোট ১২০ ঘণ্টার বেশী পাওয়া নাও যাইতে পারে। দৈনিক ২ ঘণ্টা অর্থাৎ ১২০ মিনিট সময় তিন ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া যায়। যথা,—

প্রথম পিরিয়ড [৩০ মিনিট]—মাতৃভাষা।

ঐ আলাপ-আলোচনা—১০ মিনিট।

দ্বিতীয় পিরিয়ড [৩০ মিনিট]—অঙ্ক।

ঐ আলোচনা—১০ মিনিট।

তৃতীয় পিরিয়ড [৪০ মিনিট]—আলাপ-আলোচনা অথবা আনন্দানুষ্ঠান।

বলা বাহুল্য যে তিন মাস সময়ের মধ্যে একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইলে ঢিমে তালে চলিলে চলিবে না। মাতৃভাষা ও প্রাথমিক অঙ্কের পাঠ প্রথম দুই পিরিয়ডে দিতে হইবে। বাকী ৪০ মিনিটকাল ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যবিদ্যা, পৌরশাসনবিধি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞানমূলক বিষয়ের আলোচনা, খবরের কাগজ পাঠ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানে ব্যয়িত হইবে।

স্ত্রী পুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়

বয়স্ক পুরুষ ও বয়স্কা স্ত্রীলোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কেন্দ্রের কাজের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ সন্ধ্যার

পর অর্থাৎ ৬॥টা কি ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত পুরুষদের পক্ষে সুবিধাজনক সময়। কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা গৃহস্থালির কাজকর্ম সারিয়া বেলা ২টার পূর্বে কেন্দ্রে আসিতে পারিবে না, আবার সন্ধ্যাবেলাতেও তাহারা ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত থাকিবে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত সময়টুকুই প্রশস্ত।

বয়স বিভাগ

বয়সের তারতম্য হিসাবেও বয়স্ক পুরুষদিগকে দুইটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া লওয়াই ভাল। যথা, ১২ হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত একটা বিভাগ এবং ১৮ হইতে ৪০ বা তদূর্ধ্ব পর্যন্ত আর একটা বিভাগ। যুবক বা প্রৌঢ় ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে বালক বা কিশোর বয়স্কদের সহিত একত্র বসিয়া পাঠগ্রহণ করিতে লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রে দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আরও অতিরিক্ত দুই পিরিয়ড কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবলমাত্র মাতৃভাষা ও প্রাথমিক অঙ্কে পাঠদান সম্বন্ধেই উক্তরূপ ভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। আনন্দানুষ্ঠান ও আলোচনাদির সময় উভয় দলই একত্র সমবেত হইয়া কেন্দ্রের কার্যকলাপে যোগদান করিবে।

যে রুটিন বা সময়ের নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল অবস্থাভেদে অবশ্যই উহার পরিবর্তন করা চলিবে। স্থানীয় লোকের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষক মহাশয় রুটিন প্রস্তুত করিবেন।

ভাষা-শিক্ষা

বয়স্ক ব্যক্তির অক্ষরপরিচয় কোন্ পদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা সহজ ও অল্প সময়ে হইতে পারে, এ বিষয়ে কিছু মতভেদ রহিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং মালয় উপদ্বীপে ডাঃ ফ্রাঙ্ক সি. লাওব্যাক (Frank C. Laubach) যে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা মূলশব্দ পদ্ধতি বা, key-word method নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে অধ্যাপক অনাথনাথ বসু তৎপ্রণীত "বড়দের পড়ায়" যে-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহাকে Sentence method বা বাক্যক্রমিক পদ্ধতি বলা চলে। এই বিশিষ্ট প্রণালী দুইটির বিশদ ব্যাখ্যা যথাক্রমে শ্রীবিলাস মুখোপাধ্যায়-কৃত "জনশিক্ষা সহচর" এবং অধ্যাপক অনাথ বসুর "বড়দের পড়ায়" প্রদত্ত হইয়াছে। উভয় পদ্ধতিই এখনো পর্যন্ত পরীক্ষামূলক, উহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে চরম রায় দিবার সময় এখনো আসে নাই; ব্যাপকভাবে প্রয়োগ না করিয়া এবং উহাদের ফলাফল না দেখিয়া কোন শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। কিন্তু নিরক্ষরতা সমস্যাটির গুরুত্ব এতই অধিক এবং ইহার আশু সমাধানের উপর দেশের ও সমাজের সাধারণ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এত বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতেছে যে, প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিতর্ক করিবার এখন সময় নাই। বরঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর প্রয়োগ চলিতে পারে। কিছুদিন পরে বিভিন্ন প্রণালীর গুণাগুণের একটা তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হইবে।

বর্ণমালা পদ্ধতি

যে চিরাচরিত প্রণালীতে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদিগের হাতেখড়ি দেওয়া হয় তাহাকে বর্ণমালা পদ্ধতি বা alphabet method বলা হয়। বাংলার বর্ণমালা কয়েকটি উচ্চারণমূলক (phonetic) বর্গ বা বিভাগে বিভক্ত। যথা—ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ ত-বর্গ, ও প-বর্গ। এই বর্গবিভাগ যে বিজ্ঞানসম্মত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু বর্গ-বিভাগ অনুযায়ী বর্ণমালা শিখিতে একটি শিশুর যে পরিমাণ সময় লাগে—তাহা বয়স্ক শিক্ষার্থীর বেলায় পাওয়া অসম্ভব। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে ৫।৬ বৎসর বয়স্ক শিশুর পক্ষে বাংলা অক্ষরগুলি চিনিতেই প্রায় ছয় মাস হইতে এক বৎসর সময় লাগে। কাজেই এই চিরাচরিত বর্ণমালা পদ্ধতি বয়স্কদের বেলায় অনুসৃত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লেখা ও পড়া

বয়স্কদের বেলায় লেখা ও পড়া একই সঙ্গে চলিবে। প্রথমপাঠ লেখা দিয়াই আরম্ভ হইতে পারে। বয়স্কেরা অনেক সময়ে প্রথমেই নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করা শিখিতে চাহিবে, —কারণ দৈনন্দিন জীবনে নিজ নাম স্বাক্ষরের একটা বিশেষ মূল্য আছে। ইহা ছাড়া শিশুদের ন্যায় বয়স্কেরা প্রচলিত বাংলা শব্দের সহিত অপরিচিত নহে। সাধারণতঃ ১০০০ হইতে হইতে ১৫০০ শত শব্দের সাহায্যে একজন নিরক্ষর গ্রামবাসী তাহার মনোভাব ব্যক্ত করে। বয়স্কব্যক্তিকে প্রথম পাঠদান

করিবার সময় নূতন শব্দের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই, তাহার পরিচিত শব্দের দ্বারাই পাঠের বিষয়বস্তু রচিত হইবে।

মূলশব্দ (Key-word method) কিংবা বাক্য-ক্রমিক (Sentence method) পদ্ধতি যাহাই অনুসৃত হউক না কেন, শব্দ বা বাক্যের অর্থের সহিত বয়স্ক শিক্ষার্থী পূর্ব হইতেই পরিচিত। তাহার প্রধান সমস্যা হইতেছে যে, বর্ণগুলিকে চিনিয়া লইয়া তাহাদের সাহায্যে শব্দ ও বাক্যগুলিকে কত সহজে পড়িতে ও লিখিতে পারা যায় তাহার কৌশল আয়ত্ত করা।

বয়স্ক শিক্ষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা পড়ার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। বাংলা বর্ণগুলির গঠনভঙ্গীর প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, আকৃতিগত সাদৃশ্যে অক্ষরগুলিকে কয়েকটি দল বা গ্রুপে ভাগ করা যায়। যেমন ব, র, ক, ধ, ঝ, ঋ।

ব অক্ষরটির সামান্য পরিবর্তন দ্বারা খুব সহজেই র, ক, ধ, ঝ ও ঋ এই পাঁচটি অক্ষর চিনিতে পারা যায়। আকৃতিগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বাংলা বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে কয়েকটি দলে বা গ্রুপে বিভক্ত করা হইল। যেমন—

ব র ক ধ ঝ ঋ।

[ক'য়ের আঁকড়িটি হইতে ১ অঙ্কটি শিখান যায়।]

ত অ আ ও ঔ [মাত্রাবিহীন ত'ই ৩]।

ড ড় উ ঊ ঙ জ ভ [মাত্রাবিহীন ড'ই ৬]।

য য় ষ ফ ঘ [য হইতে ২ অঙ্কটি বাহির করা অতি সহজ]।

হ ই থ। [ইহাদের সঙ্গেও ২-এর বেশ সাদৃশ্য আছে]।

এ ঐ ঞ [এ হইতে ৭ অঙ্কটি সহজেই বাহির করিয়া লওয়া যায়]।

চ ছ ট ঢ দ [চ'কে ৮-এ পরিণত করা খুবই সহজ]।

ন ণ ল শ গ প ম স।

ঠ, ঈ, ং, ঃ, ঁ এবং ৪, ৫, ৯ এই কয়টি অক্ষর ও অঙ্ক আকৃতিগত কোন বিশিষ্ট দলভুক্ত নহে। ইহাদিগকে পৃথকভাবে শিখিতে হইবে।

ধ্বনিতত্ত্বের অনুরোধে বর্ণগুলিকে প্রচলিত বর্গবিন্যাস অনুযায়ী না শিখাইয়া আকৃতিগত সাদৃশ্য অনুযায়ী শেখান অনেক সহজ ও অল্প সময়সাপেক্ষ। বয়স্কদের বেলায় এই প্রণালী বেশ উপযোগী। বর্ণগুলির সহিত পরিচয় ঘটিলে পরে বর্গবিভাগের তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়া যায়।

বর্ণ শিখাইবার সময় পূর্বোক্ত বাক্য-ক্রমিক পদ্ধতি ও মূল শব্দ পদ্ধতির একটি সংশ্লেষণ (Synthesis) করিয়া লওয়া চলে। অর্থাৎ পরিচিত ও প্রচলিত শব্দের একটি নির্বাচিত তালিকা হইতে সহজ এবং প্রথম প্রথম যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর-বিহীন শব্দ চয়ন করিয়া এবং সেই সব শব্দের সমবায়ে গঠিত অর্থবাচক বাক্যের বিশ্লেষণ দ্বারা বর্ণপরিচয় করান যায়।

দৃষ্টান্ত—

বারিধারা ঝর ঝর এই শব্দ কয়টি বয়স্কদের নিকট অর্থবাচক, শব্দগুলিও তাহাদের নিকট পরিচিত। ইহা

দ্বারা একটি কি দুইটি পাঠে ব, র, ধ, ঝ, া এবং ি এই কয়টি অক্ষর শেখান যাইতে পারে। এইরূপ সুনির্বাচিত বাক্যও শব্দের বিশ্লেষণ দ্বারা ১০।১১টি পাঠের বাংলা বর্ণমালার সহিত শিক্ষার্থীকে পরিচিত করা সম্ভব। একবার অক্ষরপরিচয় হইয়া গেলে বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে পাঠ গ্রহণ সহজ ও আনন্দদায়ক হইয়া উঠিবে।

যুক্তাক্ষর

বাংলা বর্ণশিক্ষার সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা যুক্তাক্ষর। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষরের সংখ্যা বহু। যুক্তাক্ষরগুলিকে ভাঙ্গিয়া হসন্ত দ্বারা প্রকাশ করিবার রীতি এখনও প্রচলিত হয় নাই। দুই-একজন লেখক চেষ্টা করিয়াছেন সত্য কিন্তু এখনও ছাপা বই, পত্রিকা ও সংবাদপত্র ইত্যাদি পড়িতে হইলে যুক্তাক্ষর বাদ দিলে চলে না। তবে বর্ণগুলির সহিত পরিচয় হইলে যুক্তাক্ষরগুলি চিনিয়া লওয়া খুব কষ্টসাধ্য নহে। বাংলা যুক্তাক্ষরগুলিকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। যথা,—

[১] যেস্থলে যুক্ত অক্ষর দুইটির আসল রূপ প্রায় পরিবর্তিত হয় না; যথা, চ্ + চ = চ্চ, ন্ + দ = ন্দ, চ্ + ছ = চ্ছ, ণ্ + ণ = ণ্ণ। [২] যুক্ত বর্ণ দুইটির একটি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু অন্যটির পরিবর্তন ঘটে; যথা—ন্ + ধ—ন্ধ, র্ + খ = র্খ, ষ্ + ণ = ষ্ণ ইত্যাদি। [৩] যুক্ত বর্ণ দুইটি বা তিনটি প্রত্যেকেরই রূপান্তর ঘটে; যথা,—ক্ × র = ক্র, ত্ + র + উ = ত্রু, ক্ + ত = ক্ত ইত্যাদি।

বাংলা টাইপরাইটিং ও লাইনোটাইপে যুক্তাক্ষরগুলির একটা সহজ রূপ দিবার সাধু উদ্যম চলিতেছে। হয়তো কালে এই সব পদ্ধতিই চালু হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলা ভিন্ন উপায় নাই এবং বর্ণ-পরিচয় করাইতে জটিল বানানের তুফান না কাটাইয়া কোন প্রকারেই "কূল" পাইবার উপায় নাই।

যেমন শিশুদিগের বেলায় তেমনি বয়স্কদের বেলাতেও সহজ ও সরল হইতে ক্রমশঃ কঠিন ও জটিলের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। নির্বাচিত শব্দের সাহায্যে রচিত পাঠ্যপুস্তকে পাঠগুলিকে ধাপে ধাপে (graded) সাজাইতে হইবে। প্রথম ধাপে তিনশত নির্বাচিত শব্দের তালিকার ভিত্তিতে রচিত একখানা বই হইলে ভাল হয়। প্রতিটি নূতন পাঠে নূতন অক্ষরের সহিত পূর্ব পরিচিত অক্ষর যোগ দিয়া নূতন শব্দ বাছিয়া লওয়া আবশ্যক। যেমন, প্রথম পাঠে যদি ব ক র ধ ঝ এই কয়টি অক্ষরের সহিত পরিচয় ঘটিয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাঠে ইহাদের যোগে আরও দুইটি কি তিনটি নূতন বর্ণ শিখান যাইতে পারে ; যেমন, বন, রণ, ঝনঝন, বল, কল। ন, ণ ও ল এই তিনটি নূতন বর্ণ শিখান হইল।

সম্ভবপর স্থলে কোন পরিচিত শব্দের চিত্র প্রদর্শন করিয়া শিক্ষার্থীগণকে শব্দটি উচ্চারণ করিতে বলিলে এবং উচ্চারণের সঙ্গে উচ্চারিত অক্ষরটির সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিলে অক্ষরপরিচয় দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ হইবে।

সহজপাঠ্য বই ও খবরের কাগজ

অক্ষরপরিচয়ের ভিত্তিমূল দৃঢ় করিয়া পরবর্তী শিক্ষার পথ সহজ ও সুগম করিবার উদ্দেশ্যে বয়স্কদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত সহজ্যপাঠ্য বই ও খবরের কাগজের একান্ত প্রয়োজন। এই জাতীয় পুঁথিপুস্তক লিখিবার প্রাথমিক উপকরণ হিসাবে একটা নির্বাচিত শব্দতালিকা প্রস্তুত করা দরকার। যদি প্রথম পাঠে ১০০০ হাজার শব্দ ব্যবহৃত হয়, তবে পরবর্তী পাঠ্যসমূহে ২।৩ হাজার শব্দের ব্যবহার চলিতে পারে।

এই সব পুস্তকের বিষয়বস্তু বয়স্কদের উপযোগী হওয়া চাই। আনন্দ ও জ্ঞান বিতরণ—ইহাই হইবে মূলমন্ত্র। পুস্তকের ভাষা হইবে সহজ ও প্রাঞ্জল,—চল্‌তি ভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের দাম অতি সামান্য রাখা উচিত, নচেৎ জনসাহিত্যের বহুল ও ব্যাপক প্রসার সম্ভব হইবে না। বিলাতী (Penguin ও Pelican series) বইগুলি মূল্যের দিক দিয়া এই জাতীয় সাহিত্যের উত্তম দৃষ্টান্ত। জনসাহিত্য রচনার উপকরণের নমুনাস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা গেল,—

[১] কৃষি ও পশুপালন। [২] স্বাস্থ্যরক্ষা। [৩] আর্থিক অবস্থার উন্নতি। [৪] তীর্থস্থানের বিবরণ। [৫] মহাপুরুষগণের জীবনী। [৬] পুরাণ কাহিনী। [৭] দেশ-বিদেশের খবর। [৮] বিখ্যাত উপন্যাস ও নাটকের সংক্ষিপ্ত ও সহজ সংস্করণ ইত্যাদি।

অক্ষরপরিচয়ের পর

অক্ষরপরিচয় সমাপ্ত হইবার পর সেই পরিচয়কে স্থায়ী ও পাকা বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া তোলা বয়স্কশিক্ষার একটা প্রধান সমস্যা। বহু স্থলেই দেখা যায় যে, প্রথমে দুই-তিন মাসের চেষ্টাতেই হয়ত একজন নিরক্ষর বয়স্কব্যক্তি মোটামুটি পড়িতে ও লিখিতে শিখিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। যদি অক্ষরজ্ঞান-লাভের পর "পরবর্তী শিক্ষার" যথাযথ ব্যবস্থা না করা হয়, তবে প্রাথমিক চেষ্টাটুকু সর্বতোভাবেই ব্যর্থ হইয়া যাইবার ষোল আনা সম্ভাবনা। লোকগণনার সময় যে পরিসংখ্যানমূলক তথ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে দেখা যায় যে, গড়ে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির চতুর্থ মান পর্যন্ত পাঠসাঙ্গ-করা বালকবালিকাদের শতকরা ৫ হইতে ১০ জনই চর্চাভাবে অনতিবিলম্বে আবার নিরক্ষরের পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। চারি বৎসর শিক্ষালাভের পরেও সুকুমারমতি ও তাজা স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বালকবালিকাদেরই যখন এই অবস্থা তখন মাত্র দুই, তিন অথবা চারি মাসের চেষ্টার ফলে বয়স্ক নরনারীর নবলব্ধ অক্ষরপরিচয় স্থায়িত্ব লাভ করিবে, এরূপ আশা করা অন্যায়। যে অল্প সময়ের চেষ্টায় বয়স্ক নরনারীকে নামে মাত্র সাক্ষর করিয়া তোলা হয় তাহার মূল্য স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত। আমাদের জনশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে চেষ্টা চলিতেছে শুধুমাত্র তাহার উপর ভরসা স্থাপন করিয়া

দেশব্যাপী নিরক্ষরতা সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের স্বপ্ন দেখা নিতান্তই বাতুলতা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারি বৎসরের পাঠসাঙ্গকারী বালকবালিকাদের অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ৩।৪ মাসের বর্ণশিক্ষাপ্রাপ্ত বয়স্কদের ধারণাশক্তি অধিক হইবে, এইরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মাত্র তিন অথবা চারি মাসের বর্ণশিক্ষাপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা যে আরও অল্প সময়ে এবং অনুপাতে আরও অধিক সংখ্যায় আবার নিরক্ষরতার স্তরে নামিয়া যাইবে, ইহা অতি সত্য কথা। সুতরাং পরবর্তী শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের যাবতীয় উদ্যমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। ইহা ছাড়া নিরক্ষরতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আর কোন উপায়ই এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। সত্য বটে, বিজ্ঞানের দান—বহুবিধ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমগ্র সভ্য জগতময় আজ জনশিক্ষা প্রসারের একটা বিরাট ও ব্যাপক অভিযান পরিকল্পিত ও পরিচালিত হইতেছে। চলচ্চিত্র, বেতারযন্ত্র, দূরেক্ষণ (Television) প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান আজ নানাভাবেই মানুষের শিক্ষাপ্রচেষ্টার সম্পূরকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইহারা সম্পূরক মাত্রই। শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে স্ব-শিক্ষা বা Self education একমাত্র উপায়। অক্ষরপরিচয় বা লিটারেসি কদাচ বয়স্কশিক্ষার নামান্তর নহে। অক্ষরপরিচয়ের পরবর্তী শিক্ষাই প্রকৃত বয়স্কশিক্ষা। ইংলণ্ড প্রমুখ প্রগতিশীল দেশে বয়স্কশিক্ষা বলিতে পরবর্তী শিক্ষাকেই বুঝায়, অর্থাৎ যে-সকল

নরনারী সামাজিক বা আর্থিক কারণবশতঃ প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার সুযোগ পায় নাই তাহাদের বিদ্যানুশীলনের ব্যবস্থা করাই সে-দেশের বয়স্কশিক্ষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

অক্ষরপরিচয় স্ব-শিক্ষার বাহন

লিটারেসি বয়স্কশিক্ষার প্রথম সোপান—পড়া ও লেখা শিখিবার কৌশল। শিক্ষালাভের প্রথম সোপান হিসাবে ইহার গুরুত্ব স্বতঃসিদ্ধ, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে যেখানে সাক্ষরের হার এখনও মাত্র শতকরা ২৪ হইতে ২৫। লিটারেসি বা অক্ষরপরিচয়কে কি উপায়ে প্রকৃত জনশিক্ষার বাহনরূপে কাজে লাগাইতে পারা যায়, বয়স্কশিক্ষা আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণকে সে-কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। স্ব-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা এবং অক্ষরপরিচয়ের মাধ্যমেই স্ব-শিক্ষার সূচনা হইয়া থাকে, ইহা সর্ববাদিসম্মত। সদ্য অক্ষরপরিচয়ের শুভ ফলটকু যাহাতে অভ্যাস ও অনুশীলনের অভাবে বিনষ্ট না হইয়া যায়, সে-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন কার্যকরী হইবে না। নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি লিখিতে পড়িতে শিখিয়া যদি অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে এবং তাহার নৈমিত্তিক জীবনের তাগিদে অন্ততঃ দৈনিক সংবাদপত্রখানাও পড়িতে ও বুঝিতে না পারে, তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে জনশিক্ষা-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্ফল হইয়াছে।

অনুশীলন ও অনুষঙ্গ

অনুশীলন ও অনুষঙ্গ (use and association) শিক্ষামনস্তত্ত্বের দুই প্রধান কথা। অধীত বিষয়ের অংশবিশেষ আমরা ভুলিয়া যাই আর অংশবিশেষ আমাদের মনে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিও একবার বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইয়া আবার তাহা বিস্মৃত হয়। কেন? এই ভুলিয়া যাওয়া বা পুনরায় নিরক্ষরের দলে ভিড়িয়া যাওয়ার মূলে রহিয়াছে অনুশীলনের এবং অনুষঙ্গের অভাব। শিক্ষার্থীর মনে ছাপা শব্দ, তাহার ধ্বনি ও অর্থ এই তিনের সম্পর্ক স্থায়ীভাবে গাঁথিয়া দেওয়ারই আর এক নাম শিক্ষা। চর্চা বা অনুশীলনের গুণেই নবপরিচয়ের ক্ষীণ যোগসূত্রটি ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠে আর উহার অভাবে উহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অতি সত্বর বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অক্ষরপরিচয়ের অব্যবহিত পরেই যাহাতে বয়স্ক শিক্ষার্থীর পড়িবার উপযুক্ত পাঠ্যসামগ্রীর কোন অভাব না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। জনশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি নরনারীর হাতে সহজ, সরল এবং চিত্তাকর্ষক পাঠ্যবস্তু তুলিয়া দিতে হইবে, কারণ অক্ষরপরিচয়ের পরবর্তী পাঠ হইতেই প্রকৃত জনশিক্ষার সূচনা। বয়স্কদের উপযোগী পরবর্তী পাঠের মালমশলা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করা,—জনশিক্ষা প্রোগ্রামের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না।

প্রিয় ও অপ্রিয় প্রসঙ্গ

শিক্ষামনস্তত্ত্বের আর একটি অপরিহার্য কথা এই যে, যে-প্রসঙ্গগুলি আমাদের প্রিয় সেইগুলিকেই আমাদের মন সাগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। অবাঞ্ছিত ও অপ্রিয় প্রসঙ্গগুলিকে সর্বভাবে পরিহার করাই মানবমনের ধর্ম। শিক্ষা-ব্যাপারেও একথা অতীব সত্য। যে-প্রসঙ্গ আমাদের মনঃপূত নহে তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই, আর প্রিয় প্রসঙ্গ সহজেই মনে রাখিতে পারি।

আমাদের মনটাকে অনেকটা চালুনী বা ছাকনির সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রিয় প্রসঙ্গগুলি স্থূল পদার্থের ন্যায় চালুনীর উপরিভাগে থাকিয়া যায় আর অপ্রিয় কথা, প্রসঙ্গ বা চিন্তা চালুনীর ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়ে অর্থাৎ অবচেতন মনের অতল অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। মনস্তত্ত্বের এই বহু পরীক্ষিত সত্যটিকে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে।

সংক্ষেপে অক্ষরপরিচয়ের পরবর্তী শিক্ষা বা Follow-on education এর প্রকৃত অর্থ ই হইল,—(১) বয়স্ক শিক্ষার্থীর পড়িবার উপযুক্ত যথেষ্ট পরিমাণ পুস্তক ওপত্রিকাদি প্রকাশের আয়োজন, (২) এই সব পুস্তক-পত্রিকা যাহাতে শিক্ষার্থীরা সহজে পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা এবং (৩) এই সব পাঠ্য বিষয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর আনন্দ ও উপকার বিধান।

ডাঃ হাক্সলির মত

প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশকল্পে ডাঃ জুলিয়ান হাক্সলি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। বিজ্ঞানের উন্নতি, উত্তম স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি, গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং একই বিশ্বের অধিবাসী হিসাবে আন্তর্জাতিক একত্ববোধ, —যে-শিক্ষার কল্যাণে এই সমস্ত বিষয়ের একটা সম্যক্ জ্ঞান ও ধারণা মানুষ মাত্রেরই মনে জাগাইয়া তোলা যায় তাহাই প্রকৃত সামাজিক শিক্ষা—Social Education। আরও একটু বিস্তারিতভাবে বলিলে বলিতে হয়—(১) ইহা সমাজ-জীবনের শিক্ষা (Education for community life), অর্থাৎ সমাজের অধিবাসী হিসাবে প্রত্যেক নরনারীকে তাহার দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা। (২) দ্বিতীয়তঃ ইহা অবকাশ বিনোদনের শিক্ষা, (Education for leisure)। দৈনন্দিন জীবনের অবকাশ-মুহূর্তগুলিকে সরস, সজীব ও আনন্দময় করিয়া তোলাও ইহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং (৩) নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবন-রঙ্গমঞ্চের অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়াও এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

পরবর্তী সাহিত্য রচনার মূলনীতি

উপরোক্ত মূলনীতিগুলি অনুসরণ করিয়া সদ্যসাক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিদিগের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক ও পত্রিকাদি রচনায় উদ্যোগী হইতে হইবে। একজন সবেমাত্র অক্ষরজ্ঞানলব্ধ বয়স্ক ব্যক্তির ভোকাবুলারী বা জ্ঞাত শব্দসমষ্টি গড়ে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রের অনুরূপ—অবশ্য বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিক্যাল পরিভাষা বাদে। একজন সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রায় ১০০০ হইতে ১৫০০ সদাপ্রচলিত শব্দের সাহায্যে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু একজন নূতন অক্ষরজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভোকাবুলারী যাহাই হউক না কেন, তাহার পঠন-সামর্থ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পঠন-সামর্থ্যের অনুরূপ হইবে কিনা তাহাও সন্দেহজনক। সুতরাং পরবর্তী শিক্ষার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, রচনার বিষয়বস্তু পাঠকের নিকট সহজবোধ্য হওয়া চাই। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্বাচিত শব্দতালিকার সাহায্যে পরবর্তী শিক্ষার উপযোগী সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। বাংলায় এইরূপ কোন নির্ভরযোগ্য শব্দতালিকা প্রস্তুত করা হয় নাই। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষণকেন্দ্র ও কলেজগুলিতে নূতন গবেষণার প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে। UNESCO-র বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা করিয়া এই জাতীয় সাহিত্যরচনা-বিষয়ে একটি মান বা norm নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রাক্-প্রাথমিক

পাঠ্যের এক পৃষ্ঠায় ৩০ হইতে ৪০, প্রাথমিক পাঠ্যের এক পৃষ্ঠায় ৫০ হইতে ৬০, দ্বিতীয় পাঠে ৭০ হইতে ১০০, তৃতীয় পাঠে ১২০ হইতে ১৪০, চতুর্থ পাঠে ১৫০ হইতে ২০০ এবং তৎপরবর্তী পাঠে ২৩০ হইতে ৩১০ শব্দের অধিক ব্যবহৃত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পরবর্তী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) পুনরাবৃত্তির সাহায্যে পূর্ব পূর্ব পাঠে ব্যবহৃত নূতন শব্দগুলির সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলেই শিক্ষার্থী নব-পরিচিত শব্দগুলি আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়। প্রতিটি নূতন শব্দের দশ হইতে কমপক্ষে পাঁচবার পুনর্ব্যবহার হওয়া আবশ্যক।

(২) বাক্যগুলি যথাসম্ভব সহজ ও সরল হওয়া আবশ্যক। জটিল বাক্য ব্যবহার যতদূর সম্ভব পরিহার করা উচিত। দুই-তিনটি মাত্র শব্দে গঠিত বাক্য হইতে সুরু করিয়া ক্রমশঃ বৃহত্তর বাক্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনাবশ্যক শব্দ বা বর্ণনায় রচনাকে ভারাক্রান্ত করা অনুচিত। বিষয়টি কিন্তু আদৌ সহজ নহে। নির্দিষ্ট শব্দসমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া এবং যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করিয়া সহজবোধ্য ভাষায় বয়স্ক পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা করিতে বিশেষ যত্ন ও নিপুণতা চাই। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—

> "সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে,
> সহজ কথা যায় কি বলা সহজে ?"

(৩) পরিচিত পদার্থ বা বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর বা বিষয়ের সাহায্যে উপমার অবতারণা করা অনুচিত।

(৪) রচনায় যতটা পরিমাণ সম্ভব সংলাপ ও কথোপ-কথনমূলক আখ্যান রাখিতে হইবে।

(৫) সম্ভব হইলে ধাতুর বর্তমান কাল ব্যবহারই সমীচীন।

(৬) নীরস গদ্য অপেক্ষা ছন্দোময় ছড়া অথবা নাটকীয় রচনাভঙ্গী অধিক চিত্তাকর্ষক। সরস রচনা এবং হাস্যরসের পরিবেশনে শিক্ষার্থীকে সহজে আকৃষ্ট করা সম্ভব।

(৭) রচনার বিষয়বস্তু বয়স্ক শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্য, সরস ও প্রয়োজনসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। এমন কোন বিষয়ের অবতারণা অবান্তর, যাহা দ্বারা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন অথবা নানাবিধ সমস্যা-সমাধানের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

(৮) শিশু-পাঠকের জন্য রচিত মজার গল্প, ভূতুড়ে কাহিনী অথবা কল্পনা-পরিপোষক বর্ণনা বয়স্ক পাঠকের ভাল লাগিবে না, কারণ বয়স্ক ব্যক্তি অশিক্ষিত হইলেও অপ্রাপ্তবুদ্ধি নহে।

(৯) কৃষি, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শুশ্রূষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কারুশিল্প, সহজ বিজ্ঞান, জাতীয় ঐতিহ্য ও সাহিত্য, পৌরাণিক কাহিনী, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি পরবর্তী সাহিত্য-রচনার পক্ষে অপরিহার্য।

(১০) এইসকল পুস্তক ও পত্রিকায় যথেষ্ট পরিমাণে ছবি, নক্সা ও মানচিত্র সংস্থাপিত করা ভাল। শুধু পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্যই নহে, ছবি ও নক্সার সহায়তায় যত সহজে

একটা বিষয়ের ব্যাখ্যা সম্ভব, রচনা দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না।

(১১) এইজাতীয় পুস্তক-পত্রিকা-মুদ্রণ-ব্যাপারেও কিছু বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা আবশ্যক। ছাপার হরফ অতি ক্ষুদ্র হইলে বয়স্ক পাঠকের অসুবিধা হইবার কথা। বাংলায় সাধারণতঃ গ্রেট প্রাইমার এবং ১৪-পয়েণ্টের হরফ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষেত্র-বিশেষে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ হরফও ব্যবহার করা চলে। মুদ্রিত পুস্তকের আকার পকেট-সাইজ হইলে মন্দ হয় না।

পরবর্তী শিক্ষার প্রসারের জন্য যেমন উপযুক্ত পুঁথি-পত্রের প্রচুর আয়োজন আবশ্যক, তেমনি আবার এই সকল পুঁথি-পুস্তকের বহুল প্রচলনের জন্য দেশব্যাপী স্থায়ী পাঠাগার ও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন।

//সমাজবোধ ও সামাজিক চেতনা

UNESCO-র প্রাক্তন ডিরেক্টর-জেনারেল ডাঃ জুলিয়ান হাক্সলি জনশিক্ষার যে-সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যে-শিক্ষায় মানুষ নিজেকে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের সহিত সুষ্ঠুভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে, যে-শিক্ষা তাহার আর্থিক উন্নতি ও শারীরিক স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপোষক এবং যে-শিক্ষার কল্যাণে তাহার মনে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বচেতনার উন্মেষ হয় এবং পক্ষান্তরে যে-শিক্ষা তাহাকে সমাজ, দেশ ও বিশ্বের প্রতি তাহার কর্তব্য ও দায়িত্বপালনে অনুপ্রাণিত করে এবং তাহার ন্যায্য অধিকার-সংরক্ষণের যোগ্যতা দান করে, তাহাই প্রকৃত জনশিক্ষা। বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। মানুষমাত্রেরই মানুষ হিসাবে যেমন সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তেমনি আবার সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাহার কতকগুলি দাবী এবং অধিকারও আছে। যেখানে মানুষ তাহার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ অথবা উদাসীন, সেখানেই শিক্ষার ব্যর্থতা। বহু সামাজিক অসাম্য ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মূলেই রহিয়াছে শিক্ষার এই দৌর্বল্য ও গলদ। বর্তমানবিশ্বব্যাপী জনশিক্ষা-আন্দোলনের পশ্চাতে যে আদর্শবাদ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য শিক্ষার এই ত্রুটি দূর করিয়া মানুষের মনে তাহার অধিকারবোধের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য-

জ্ঞানকে সজাগ করিয়া তোলা। অধিকারবোধ-সূচনার পূর্বেই দায়িত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। দায়িত্বপালন হইতেই অধিকারের সৃষ্টি। দায়িত্বহীন অধিকার-অনধিকারেরই নামান্তর। সুতরাং পৌরচেতনা ও পৌরদায়িত্ব-বোধের বিকাশ-সাধন জনশিক্ষার একটা বড় কথা।

পৌরচেতনা বলিতে কেবলমাত্র দেশের আইন-কানুন এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো (Constitution)-সম্বন্ধীয় পুঁথিগত জ্ঞানটুকুই বুঝায় না। প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ পৌরশিক্ষার কথাটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত অর্থে পৌরশিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা একান্তই সঙ্কীর্ণ ও তত্ত্বমূলক (theoretical)। প্রকৃত পৌরশিক্ষা কেবল তত্ত্বমূলক জ্ঞান নহে, বাস্তবক্ষেত্রে দায়িত্বপালন এবং অধিকারসম্ভোগ। সুতরাং জনশিক্ষা-কেন্দ্রের কর্মীকে প্রচলিত অর্থে পৌরশিক্ষার সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞাটুকুর ব্যাখ্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকিলেই চলিবে না। অর্থাৎ পৌরশাসন-বিধির একখানা প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের অংশবিশেষ পড়াইয়া তাহার কর্তব্য শেষ হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নাগরিকের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা এবং সেই দায়িত্বপালনের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করাই পৌরশিক্ষার প্রধান কাজ।

পৌরশিক্ষার বিষয়বস্তু ঃ

পৌরশিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই যে-কথাটি বিবেচনা করা আবশ্যক, তাহা এই যে,

শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনের সহিত সম্পর্কহীন কতকগুলি উচ্চাঙ্গের নীতিকথার অবতারণা অনাবশ্যক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রকারভেদ এবং সমাজপ্রগতির বিভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের এবং কঙ্গো-উগাণ্ডার অধিবাসিগণের সামাজিক অবস্থার বিরাট ব্যবধান অতি সুস্পষ্ট। সামাজিক পরিবেশের প্রকারভেদে পৌরশিক্ষার বিষয়বস্তুর তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ ইংলণ্ডের প্রগতিশীল জনসমাজে যে-মান বা স্ট্যাণ্ডার্ডের পৌরশিক্ষা চলিতে পারে, আফ্রিকার অরণ্য-অঞ্চলের অধিবাসিগণের নিকট সেই স্ট্যাণ্ডার্ডের পৌরশিক্ষা বহুলাংশেই অর্থহীন। যেমন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের জনশিক্ষায় যানবাহন-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী (Traffic education) একটি আবশ্যিক আলোচ্য বিষয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সমাজের জনশিক্ষায় ইহার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু সামাজিক প্রগতি ও পরিবেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কতকগুলি মূল বিষয়ে সভ্য ও অসভ্য, উন্নত ও পশ্চাৎপদ মনুষ্যসমাজের ব্যক্তিমাত্রের শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত। পৌরশিক্ষার কতকগুলি মূলসূত্র বা বিষয়বস্তুর আলোচনা ও অনুশীলন সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই আবশ্যক।

ব্যক্তি ও সমাজ-নির্বিশেষে জনশিক্ষার কয়েকটি মূলসূত্র বা উদ্দেশ্য এখানে বিবৃত করা হইল—

আত্মসম্ভ্রম-বোধ ঃ

(১) প্রত্যেক মানুষের মনেই আত্মসম্ভ্রম (Self-dignity) এবং জীবনের মূল্যবোধ (value) জাগাইয়া তোলা আবশ্যক। নানা স্বার্থ ও শ্রেণীসংঘাত-বিক্ষুব্ধ সমাজের নিম্নস্তরের উপেক্ষিত নরনারীর মধ্যে যুগ-যুগান্তের সামাজিক অবিচারের ফলে এমন একটা হীনতা ও দীনতার ভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, মানুষ নিজের সত্তা ও স্বাধিকারের কথা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে অন্যের অপেক্ষা অধম বলিয়া ভাবিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মধ্যভারতের কোন এক পল্লী-অঞ্চলে পদব্রজে পরিভ্রমণ-কালে স্বামিজী একদিন তামাকু-সেবনেচ্ছু হইয়া পথিপার্শ্বস্থ একজন ভাঙ্গির নিকট ছিলিম চাহিয়াছিলেন। স্বামিজীর সন্ন্যাসিমূর্তি দেখিয়া ভাঙ্গি তাঁহাকে ছিলিম দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে। এই কুণ্ঠার মূলে ছিল পুরুষানুক্রমিক বদ্ধমূল সংস্কার,—তাহার হীনতার ভাব। তাহার ন্যায় অন্ত্যজের স্পৃষ্ট ছিলিম একজন উচ্চবর্ণীয় সন্ন্যাসীকে দেওয়া সমাজবিরুদ্ধ অধর্মের কাজ, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। ইহাতে সে ঘোর পাপে লিপ্ত হইবে এবং এই পাপের ফলে তাহার হইবে নরক-বাস ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের সমাজে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়—যাহারা নিম্নশ্রেণীর, যাহারা অস্পৃশ্য, যাহারা বঞ্চিত, তাহাদের ন্যায্য অধিকার তাহাদিগের দিলেও তাহারা প্রথমেই উহা গ্রহণ করিতে পারে না। ইহার মূলেও রহিয়াছে এইসব

অজ্ঞ, অনাদৃত ও উপেক্ষিত মানুষের মজ্জাগত হীনতার ভাব ও আত্মসম্মানের একান্ত অভাব। পৌরশিক্ষার সাহায্যে তাহাকে অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহাকে মানুষের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পদমর্যাদা অথবা রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রভৃতি নির্বিশেষে মানুষমাত্রেই পরস্পর সমান। সমাজের পক্ষে হিতকর প্রত্যেক কাজ বা পেশা-ই সম্মানজনক। বেশভূষা বা আদবকায়দার চাকচিক্য অথবা অন্য কোন কারণেই শহরবাসীরা পল্লীবাসীদের অপেক্ষা উন্নত ও সম্মানার্হ জীব নহে। মানুষ যে-কোন নিচু অবস্থা হইতে স্বীয় চরিত্রবলে ও গুণপনায় উচ্চ অবস্থা লাভ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। আত্মসম্মানবোধ জন্মাইতে হইলে প্রত্যেক মানুষকেই এই শিক্ষা দিতে হইবে। মৌখিক বা আলোচনামূলক শিক্ষার সঙ্গে কতগুলি অভ্যাস, আচার-ব্যবহার বা অনুষ্ঠানের প্রবর্তনও আবশ্যক, যথা—ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে অবাধ সামাজিক মেলামেশা, পল্লী বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বগ্রহণে সকলের সম-অধিকার ও সমভাবে যোগদান, সকল শ্রেণীর বালকবালিকাদিগের জন্য একই বিদ্যালয়-স্থাপন, সামাজিক বৈষম্যের বিলোপ-সাধন এবং সমাজের উচ্চপদস্থ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের তথাকথিত 'নিচু' কার্যে অংশগ্রহণ এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে যে-কোন 'উচ্চ' কার্যে অংশগ্রহণে সুযোগ-সুবিধা-প্রদান।

সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা ঃ

(২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক পদমর্যাদা-নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সৌজন্যপ্রদর্শন এবং নিজ স্বার্থের ন্যায় অন্যের স্বার্থসংরক্ষণ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়েই এমন কতকগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষিত হয়, যাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমাদের পৌরশিক্ষার এখনও অনেক বাকী। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত অনেকেই নিজের স্বার্থ ও অধিকার সম্বন্ধে খুব সচেতন, কিন্তু অন্যেরও যে ঠিক অনুরূপ অধিকার ও স্বার্থ থাকিতে পারে, সে-বিষয়ে অজ্ঞ বা উদাসীন। ইহার মূলে অনেক সময় থাকে অজ্ঞতা, চিন্তাহীনতা অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ভুলিয়া যাই যে, অন্য দশের স্বার্থের সহিত আমার স্বার্থও জড়িত রহিয়াছে। একজন গৃহস্থের বাড়ীতে কোন ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ হইয়াছে, তাহার উচিত যাহাতে রোগ-সংক্রমণ প্রতিবেশীর বাড়ীতে প্রসারলাভ না করে, সে-বিষয়ে চেষ্টা করা। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই সেই দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যায়। সাধারণ পুস্তকাগারের মূল্যবান গ্রন্থের অংশবিশেষ ছুরি বা কাঁচি দিয়া কেহ কাটিয়া রাখিল—ইহাতে সেই ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি এবং পৌরজ্ঞানের অভাবই প্রকাশ পায়। পরের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার, পরের স্বার্থসংরক্ষণ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ও সাহায্যমূলক ব্যবহার, সমাজ ও দেশসেবার অনুপ্রেরণা এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যে কোন-না-কোন প্রকারে অন্যের উপর নির্ভরশীল, এই

সত্যের তাৎপর্য-অনুধাবন ইত্যাদি বিষয় পৌরশিক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। কথাবার্তায়, ব্যবহারে, চালচলনে এবং সম্বোধনের রীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্মান ও সৌজন্য পাইবার অধিকারী। আমরা একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করি, কিন্তু চাষী, মজুর ও ভৃত্যশ্রেণীর লোকদিগকে অবজ্ঞাসূচক 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতে অভ্যস্ত। ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

সামাজিক একাত্মবোধ ঃ

(৩) সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই সমাজের সহিত তাহার একাত্মবোধ জাগাইয়া তোলাও পৌরশিক্ষার অন্যতম বিষয়বস্তু। ধর্মমূলক বৈষম্য, জাতিভেদ, আর্থিক অবস্থার বৈষম্য, ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-বিরোধ প্রভৃতি নানা কারণে পল্লী ও সমাজজীবনের ঐক্যের মূল শিথিল হইয়া আসিতেছে। সমাজের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির মমতা ও একাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইলে সমবায়-প্রথার ব্যাপক প্রবর্তন, সর্বজনীন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন, ক্রীড়াকৌতুকাদি ও অভিনয়ের ব্যবস্থা এবং সামাজিক পঙ্‌ক্তি-ভোজনের কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। সমাজের সহিত একাত্মবোধ হইতেই সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের উপর কোন-না-কোন ভাবে নির্ভরশীল, সেই ধারণা জন্মে।

বহুত্বের মাঝে একত্বের প্রকাশ ঃ

(৪) সাতটি বিভিন্ন রঙের সমাবেশে সুদর্শন রামধনুর সৃষ্টি, পাঁচটি পাপড়ির সমবায়ে গঠিত হয় সুন্দর একটি ফুল। বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সমবেত প্রচেষ্টাতেই বিরাট ও বৈচিত্র্যময় মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই বোধ থাকা উচিত যে, দেশ বা জাতির কৃষ্টি কোন একজন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের অবদান নহে—উহা প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও সমাজের সম্মিলিত সাধনার অখণ্ড ফলস্বরূপ। Unity in diversity—বহুত্বের মধ্যেই একত্বের বিকাশ, ইহাই কৃষ্টি-বিবর্তনের মূল-সূত্র। এই একত্ববোধের অভাব হইতেই সাম্প্রদায়িক কলহ, জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ এবং বহু অনর্থের উদ্ভব হয়। একত্ববোধের উদার ভিত্তিতেই পৌরশিক্ষার বুনিয়াদ রচিত হওয়া আবশ্যক। অজ্ঞতা এবং সঙ্কীর্ণ জ্ঞান হইতে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফলস্বরূপ এই ভেদবুদ্ধি ও ভেদজ্ঞান বহু অনর্থ ও অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা, বিভিন্ন ধর্মের মূলনীতি ও তত্ত্বের অনুধাবন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মহাপুরুষ ও মনীষিগণের জীবনচরিত-আলোচনা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান, মেলামেশা ও পরস্পরের সহযোগিতা প্রভৃতি উপায়ে এই একত্ববোধের ভাব জাগাইয়া তোলা সম্ভব।

বিশ্বের সহিত আত্মীয়তাবোধ ঃ

(৫) 'জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে-জাতির নাম মানুষ জাতি'—ইহা কি শুধু কবির কল্পনা? এই স্বপ্ন কি বাস্তবে পরিণত হইতে পারে না? এই প্রশ্নটি আজ মানব-সমাজের কল্যাণকর্মীদের নিকট প্রধান চিন্তার বিষয়। কবি-কল্পনাপ্রসূত বিশ্বপ্রেম উচ্চাঙ্গের কাব্য, দর্শন ও ভাববিলাসের বিষয়বস্তুই নহে, পরন্তু হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর নিত্য-নিঠুর দ্বন্দ্বের অবসান এবং সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ সুখশান্তির একমাত্র উপায়। বহু বিভেদ ও শত-সহস্র বৈচিত্র্য এবং বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও ধরাপৃষ্ঠের অধিবাসী মানুষমাত্রেই এক বিরাট আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রগতির যুগে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং একজাতির কল্যাণে সমগ্র মানবজাতিরই কল্যাণ, এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের সৃষ্টি করা পৌরশিক্ষার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ হইতেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সূচনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'লীগ অব্ নেশন্স্'-এর জন্ম হইয়াছিল। আবার দ্বিতীয় মহাসমরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হইতেই 'সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ'-এর (U. N.) উদ্ভব হইয়াছে। ইহার বহু শাখাপ্রশাখা সম্বলিত কর্মপরিষদ এবং ব্যাপক ও বিস্তৃত কর্মপন্থা এবং সর্বোপরি 'বহুজনহিতায় জগদ্ধিতায়' নীতির সাফল্যের উপর জগতের তথা মানবসমাজের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মহান উদ্দেশ্য

ও কর্মপন্থার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম এবং উহার সাফল্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা পৌরশিক্ষার একটি অপরিহার্য আলোচ্য বিষয়।

সক্রিয় নাগরিকত্ব :

(৬) কিন্তু পৌরশিক্ষা কেবল আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা বা পুঁথিপাঠে সীমাবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। সক্রিয়ভাবে নাগরিকের কর্তব্যপালন এবং নাগরিকের অধিকারভোগ ভিন্ন পৌরচেতনা ও পৌরদায়িত্বের প্রকৃত উন্মেষ হইতে পারে না। পৃথিবীর বহু দেশ ও বহুসংখ্যক নরনারী এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত পৌরচেতনা ও পৌরদায়িত্বের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জাতি, ধর্ম, ও বর্ণ-নির্বিশেষে জগতের প্রত্যেকটি নরনারীই রাজনৈতিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারী—এই অবিসংবাদী সত্যকে তাহার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নরনারীকেই রাষ্ট্র, দেশ ও সমাজের প্রতি তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা এবং যথাযথভাবে সেই দায়িত্বপালনে অনুপ্রাণিত করা পৌর-শিক্ষার কাজ—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কতকগুলি আবশ্যক বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকা

প্রয়োজন, যথা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ভোটাধিকার, দেশের শাসনতন্ত্র, স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ, দেশের আইন-কানুন, সামাজিক রীতিনীতি, দেশ-শাসন-বিভাগের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কর্তব্য ও দায়িত্ব, স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠন এবং পরিচালনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কেবল 'থিয়োরি'মূলক জ্ঞানলাভই পৌরশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রত্যেক নরনারীকে উৎসাহিত ও উপযুক্ত করিয়া তোলাও জনশিক্ষার কাজ।

সোভিয়েট রাশ্যায় জনশিক্ষা

বর্তমান যুগে পৃথিবীর যে-সকল দেশ ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সোভিয়েট রাশ্যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জার-শাসনের শেষভাগেই প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য উদ্যম চলিতে থাকে। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রাক্কাল পর্যন্তও গোটা দেশের অর্ধেকেরও বেশী, এবং বিশেষ করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল। উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের উপজাতীয়দের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। শিক্ষাব্যবস্থা দূরের কথা, ইহাদের কোন লিখিত বর্ণ বা লিপিই ছিল না।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবের চরম জয়লাভের পূর্বেই এই মর্মে এক হুকুমনামা জারি করা হইল যে, আট হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেকটি নিরক্ষর নরনারীকেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাক্ষরতা অর্জন করিতে হইবে। যাবতীয় পুরাতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরক্ষরদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিবার হুকুম জারি করা হইল। নূতন স্কুল স্থাপন করা হইল। যে-সকল শ্রমিক ও কর্মী এই সব স্কুলে লেখা-পড়া শিখিতে আসিত, তাহাদিগকে পুরা বেতনসহ দৈনিক দুই ঘণ্টা করিয়া ছুটি দেওয়ার আদেশ হইল। প্রয়োজন-মত যে-কোন গীর্জা, ক্লাব, অফিস-গৃহ এবং সাধারণের বাড়ী-

ঘর শিক্ষার কাজে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় জনশিক্ষা-বিভাগের হাতে ন্যস্ত করা হইল।

আর সঙ্গে সঙ্গে এই হুকুমনামা যাহাতে যথারীতি পালিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে আইনও বিধিবদ্ধ করা হইল। সেই সময়েই দেশব্যাপী নিরক্ষরতা-দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি সরকারী কমিশন এবং একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়। এই দুই প্রতিষ্ঠান ১৯১৭ সনের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা সমূলে দূর করিবে বলিয়া এক পরিকল্পনা এবং কর্মপন্থা অবলম্বন করে। ইহাদের নির্দেশানুযায়ী, সাম্যবাদী দল (Communist Party), সাম্যবাদী যুব-সংস্থা (Communist Youth League) সারা দেশময় জনশিক্ষা-কেন্দ্র খুলিয়া দেয় এবং তাহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করে। ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমবায়-সমিতিগুলি তাহাদের সদস্যগণের জন্য স্থানে স্থানে জনশিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করে। রেলওয়ে এবং ওয়াটারওয়ে বা জাহাজকর্মী সমিতিগুলির উদ্যম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, কেন না, ইহাদের চেষ্টা ছাড়া জনশিক্ষা-আন্দোলন শহর ও শিল্পাঞ্চল হইতে দূরে গ্রামে-গ্রামে ছড়াইয়া পড়া সম্ভব হইত না। স্কুল-কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা, চিকিৎসক, উকীল-মোক্তার, অফিসের কেরানী, অফিসার মায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়গামী ছাত্র ও ছাত্রী, এক কথায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই জনশিক্ষা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। প্রত্যেককেই নিজ নিজ এলাকায় একটি করিয়া Likpunkt (নিরক্ষরতা-দূরীকরণ-কেন্দ্র)

খুলিতে বলা হইল। ‘প্রত্যেকে মোরা পরের তরে’ অথবা ‘Each one teach one’ এই শ্লোগানকে প্রকৃত কাজে পরিণত করিবার একটা বিপুল প্রয়াস চলিতে লাগিল।

লোক্যাল অথরিটি বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান-সমূহ জনশিক্ষা সম্প্রসারণে নিজ নিজ তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ করিল। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট মোট ব্যয়বরাদ্দের এক-পঞ্চমাংশ এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তদপেক্ষাও কিছু বেশী অর্থ জনশিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিতে লাগিল। ট্রেড-ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতিগুলি নিজ নিজ এলাকায় স্থাপিত likpunkt-গুলির দরুণ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিত এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সমিতিগুলি ছোট এবং দরিদ্র সমিতি-গুলিকে অর্থ সাহায্য দিত।

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হইল না। প্রথম কারণ, বিপ্লবী গভর্ণমেণ্টের (Revolutionary Government) টলটলায়মান অবস্থা। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরবর্তী কয়েক বৎসর নূতন গভর্ণমেণ্টকে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-শক্তিসমূহের (Capitalistic States) প্রতিকূলতাসম্ভূত আন্তর্জাতিক বিপদ—এই দুই সঙ্কটের মাঝখানে শিশুরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত ও সংশয়ান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই আট হইতে পঞ্চাশ বৎসরের প্রত্যেকটি নরনারীকে বাধ্যতামূলকভাবে সাক্ষর করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে

যে-আইন ১৯১৯ সনে জারী হইয়াছিল তাহা আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই, এবং ১৯২৭ সনের মধ্যে রাশ্যায় জন-নিরক্ষরতাও দূর হয় নাই, যদিও সেই বৎসরের খতিয়ানে দেখা যায় যে, দেশের নানাস্থানে স্থাপিত likpunkts-এর সংখ্যা বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং গোটা দেশে দশ লক্ষাধিক বয়স্ক নরনারী এই সব কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। ১৯৩০ সন এবং তৎপরবর্তী বৎসর-কয়েকের মধ্যে জনশিক্ষার অতি দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকে। ইহার প্রধান কারণ যন্ত্রশিল্পের প্রসার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী এই সময়ে রাশ্যায় শিল্পবিপ্লব (Iudustrial Revolution) সংঘটিত হয়। অসংখ্য বড়-ছোট-মাঝারি কলকারখানা এবং যৌথ কৃষিক্ষেত্র (Collective farming) ইত্যাদি স্থাপিত হয়। নূতন নূতন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং হাজারে হাজারে শ্রমিক এবং কর্মীর চাহিদা দেখা দেয়। দূর গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া দলে দলে নরনারী এই সকল নবগঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান-সমূহের কাজে যোগদান করিতে আসে। কলকারখানার শিল্পী, কর্মী এবং শ্রমিকদিগকে শিক্ষিত বা অন্ততঃপক্ষে সাক্ষর করিয়া তুলিবার একটা জরুরী তাগাদাও অনুভূত হয়। বিজ্ঞানের যুগে অশিক্ষিত শ্রমিক ও কর্মী অপেক্ষা শিক্ষিত শ্রমিকের কার্যদক্ষতা যে বহুগুণে বেশী সেকথা বলাই বাহুল্য। শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ দুই-ই বৃদ্ধি পায় যদি কর্মী হয় শিক্ষিত বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব যেরূপ সেদেশে সর্বজনীন জাতীয় শিক্ষা-

প্রসারের হেতু হইয়াছিল সোভিয়েট রাষ্ট্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিল।

১৯৩০-৩২ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের আট হইতে বারো বৎসর বয়স্ক যাবতীয় বালক-বালিকার জন্য সর্বজনীন আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। এই ব্যবস্থা কাজে পরিণত হওয়ার ফলে জননিরক্ষরতা সমস্যা সংহত ও হ্রাস-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ওই সময়ের মধ্যেই likpunkts বা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া পঞ্চাশ-ষাট লক্ষে দাঁড়াইল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ক্যালিনিন হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, বিপ্লবোত্তর চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের মধ্যে প্রায় চার কোটি প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ নিজ নিজ ভাষায় লিখিতে এবং পড়িতে শিখিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই এই মর্মে একটি আইন বিধিবদ্ধ করা হইল যে, গ্রাম-সোভিয়েট (Village Soviet), যৌথ কৃষি-সংস্থা (Collective farms) এবং অন্যান্য যাবতীয় সরকারী অফিস-আদালত প্রভৃতিতে নির্বাচিত সদস্যপদ কিংবা বৈতনিক চাকুরী লাভ করিতে হইলেই সাক্ষরতার নিদর্শন দেখাইতে হইবে। সাম্যবাদী (Communist) দলের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী (১৯৩৩-৩৭) পরিকল্পনানুযায়ী জন-নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন সন্তোষজনক সাফল্য লাভ করিয়াছে, যদিও ১৯৪৬ সনে শিক্ষা-বিভাগীয় এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে,সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া সুদূর ও দুর্গম পল্লী-অঞ্চলে তখনও পর্যন্ত

নিরক্ষরতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মোট কথা, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণ সাক্ষরতা অর্জন করিয়াছে—একথা বলা চলে। নিরক্ষরতা কিছু কিছু থাকিলেও উহাকে ছোটখাট স্থানীয় সমস্যা বলিয়াই ধরিতে হইবে। জন-নিরক্ষরতা আজ আর সোভিয়েট রাশ্যার ব্যাপক জাতীয় সমস্যা নহে।

লৌহ-যবনিকার অন্তরালে

দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় দেশ সোভিয়েট রাশ্যা (Russia)! নিশ্ছিদ্র লৌহ-যবনিকার অন্তরালে নিত্য কত কী অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা লইয়া আজ জল্পনা-কল্পনার অবধি নাই। প্রবল ইঙ্গ-মার্কিণ প্রচারের দৌলতে রাশ্যার রহস্যোপাখ্যান যেন আরও রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই রহস্যের আবরণ ভেদ করিয়াও যে-সংবাদ মাঝে মাঝে সাধারণের গোচরীভূত হয়, তাহা অল্প এবং অসম্পূর্ণ হইলেও অভিনব এবং কৌতূহলোদ্দীপক। দেশশাসন-ব্যবস্থা, সমাজ-বিন্যাস, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যৌথ চাষাবাদ ইত্যাদির ন্যায় সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থাও আজ জগতের শিক্ষাবিদ্ মাত্রেরই চিন্তার খোরাক যোগাইতেছে।

শিক্ষা-ব্যাপারে সোভিয়েট রাশ্যার অবদান হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রাক্-বিপ্লব বা জার (Czar)-শাসিত রাশ্যার অবস্থা কিরূপ ছিল একটু জানা আবশ্যক।

জারের আমলে বিভিন্ন আঞ্চলিক জনসংখ্যার শতকরা শিক্ষিত বা সাক্ষরের হার মাত্র এক হইতে আঠারর অধিক ছিল না। এই বিশাল দেশের বিপুল জনসংখ্যার শতকরা ৭২ হইতে ৯৯ জনই ছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর। ১৯১৯ সনের বিপ্লবের ফলে যখন দেশ-শাসনের ভার লেনিন-পরিচালিত বলশেভিক দলের হাতে আসিয়া পড়িল, তখন

সাম্যবাদী বিপ্লবীদিগকে যে-জটিল সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, দেশব্যাপী অশিক্ষার অচলায়তন ছিল সেই সকল সমস্যার অন্যতম। সমস্যার জটিলতা ও গুরুত্ব এবং সময়ের অল্পতা বিবেচনা করিলে এই নূতন দলের কার্যক্ষমতা যে সত্যই অতুলনীয়, সে-কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও আজ সোভিয়েট রাশ্যায় আট হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি বালক-বালিকা অথবা নর-নারী সাক্ষর বলিয়া পরিগণিত। কোন্ যাদুমন্ত্রে জনশিক্ষার এত দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার সম্ভব হইল? ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, বলশেভিক পার্টি যখন এই বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তখন না ছিল যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষক, না ছিল যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষোপকরণ, না ছিল বিদ্যালয়-গৃহ এবং সর্বোপরি না ছিল গভর্ণমেণ্টের আর্থিক সাচ্ছল্য।

অবস্থার এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশ্যার শিক্ষা-প্রগতি আজ যে-কোন সভ্যদেশের সমতুল্য। জার-আমল ও বিপ্লবোত্তর যুগের শিক্ষা-বিষয়ক কয়েকটি তুলনামূলক সংখ্যার বিচার করিলে বর্তমান অবস্থার একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

	১৯০৯ সন	১৯৪০ সন
রাশ্যার মোট জনসংখ্যা	১৩,৯০,০০,০০০	১৯,৩০,০০,০০০
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের উপস্থিতি	৭৮,০০,০০০	৩,৫০,০০,০০০

	১৯০৯ সন	১৯৪০ সন
উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রের উপস্থিতি	১,১২,০০০	৬,২০,৮০০
প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা	৮,৬০,০০,০০০	৭০,১০,০০,০০০
শিক্ষকের সংখ্যা	৯২,৪০০	১০,০০,০০০
শিক্ষাখাতে ব্যয়	১৩,৬৭,০০,০০০ (রুবল)	৬১৭,৯০,০০,০০০ (রুবল)

কুড়ি বৎসরকালের মধ্যেই চার কোটিরও অধিক প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর নরনারী আক্ষরিক জ্ঞান ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। শিক্ষার কোন একটি বিশিষ্ট শাখাতেই এই অগ্রগতি সীমাবদ্ধ থাকে নাই, পরন্তু শিক্ষার প্রসার হইয়াছে বহুমুখী এবং সর্বজনীন। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম গবেষণামূলক শিক্ষা পর্যন্ত যাবতীয় স্তরেই এক অভূত-পূর্ব কর্মচাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রগতির রথ দুর্বার বেগে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

এই অভাবনীয় উন্নতির মূল কোথায়? তদানীন্তন প্রায় সমগ্র সভ্য জগৎ ছিল এই শিশুরাষ্ট্রের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আভ্যন্তরীণ দলগত দলাদলিরও অভাব ছিল না। রাজকোষ শূন্যপ্রায়। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তড়িৎগতিতে শিক্ষার প্রসার সম্ভব হইয়াছে একটি মাত্র কারণে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মনেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষার সর্বজনীন প্রসার ভিন্ন জাতীয় উন্নতি কদাচ সম্ভবপর নয় এবং সেইজন্য জাতির যাবতীয় সমস্যার পুরোভাগে শিক্ষার স্থান নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। শিক্ষা-ব্যাপারে কোন বাধা-বিঘ্নকেই স্বীকার করিয়া লওয়া

হয় নাই। অবস্থা বিশেষে নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে চালু করার জন্য কখনো কখনো কঠোর আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে। আজকাল বাড়ী রিকুইজিশন করার কথা অহরহই শুনা যায়। অক্টোবর-বিপ্লবের অব্যবহিত পরে একটি অর্ডিনান্স দ্বারা রাজ্যের যাবতীয় সুরম্য ও সুবৃহৎ অট্টালিকা স্কুল, নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়রূপে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপ আর একটি অর্ডিনান্স দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ বয়সের প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে অক্ষরজ্ঞান বা লিটারেসি অর্জন করা বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই আইন-প্রতিপালনের অক্ষমতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত এবং আইনভঙ্গকারীগণের Bread Ticket বা রেশন কার্ড পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হইত। রেশনকার্ড-বাজেয়াপ্তির অর্থ, নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বহুগুণ বেশী দিয়া আহার্য সংগ্রহ করিতে বাধ্য হওয়া। কিন্তু সর্বোপরি যে-কারণে এই বিরাট শিক্ষা-অভিযান সাফল্যলাভ করিয়াছিল, তাহা হইল জনসাধারণের মনে শিক্ষার প্রতি তীব্র অনুরাগসঞ্চার। সর্বসাধারণের উৎসাহ ও সহযোগিতা ভিন্ন এতবড় একটা আন্দোলন সফল হইতে পারিত না। জাতির প্রত্যেকটি নরনারীর মনে শিক্ষার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ জাগাইয়া তোলাই রাশ্যায় জনশিক্ষা-আন্দোলনের মূলমন্ত্র। রাশ্যা এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আজ রাশ্যার কর্তৃপক্ষ জনশিক্ষার পরিধিকে কেবলমাত্র আক্ষরিক বা প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডীর

ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন না। সর্বজনীন জনশিক্ষার মান অন্ততঃপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত উন্নীত করিতে তাঁহারা সচেষ্ট হইয়াছেন।

বেশীর ভাগ পল্লী-অঞ্চলেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বালক-বালিকাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে যে-কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যালয়সমূহেও সেই একই কারিকুলাম অনুসৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার বিষয়বস্তু একই। প্রাপ্তবয়স্কদের পড়াশুনার সময় সন্ধ্যাকাল এবং সপ্তাহে চারদিন ইহাদের ক্লাশ বসে। দূরবর্তী পল্লী-সমূহের অধিবাসিগণের সুবিধার জন্য নিয়মিত পত্রালাপ মারফৎ (Correspondence course) শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এইজন্য বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীও নিযুক্ত করা হয়—ইঁহারা নিয়মিতভাবে দূরদূরান্তের গ্রামগুলি পরিদর্শন করিয়া পত্রালাপী শিক্ষার্থিগণকে উপদেশ দান করিয়া থাকেন এবং সম্মিলিত অথবা এককভাবে, যার যেমন দরকার, প্রত্যেক বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর পাঠগ্রহণে সাহায্য করিয়া থাকেন।

কেন্দ্রীয় প্রাপ্তবয়স্ক-শিক্ষাবিভাগের কার্যকলাপ মোটামুটি এইরূপ :—

(১) যুদ্ধোত্তর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী পাঠ্যবিষয়ে সিলেবাস রচনা।

(২) বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালনা ও শিক্ষকগণের সম্মেলন বা সেমিনার আহ্বান।

(৩) পত্রালাপ মারফৎ শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ রচনা।

(৪) এই সব নির্দেশ মুদ্রণ ও প্রচার;

(৫) বয়স্কশিক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় সংখ্যামূলক তথ্য বা স্ট্যাটিস্টিক্স্ সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া পাঠচক্র স্থাপন ও পরিচালনা করাও এই বিভাগের কার্যসূচীর অন্তর্গত। প্রত্যেক পাঠচক্রে অন্ততঃপক্ষে চল্লিশ জন সদস্য স্থানীয় মাধ্যমিক শিক্ষক বা শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে পাঠচক্রের পাঠ ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

ছোট-বড় প্রত্যেক অঞ্চলেই পাঠ ও আলোচনার কাজ সুষ্ঠুরূপে চালাইবার জন্য একটি পাঠকেন্দ্র স্থাপিত হয়। অন্যান্য কাজের মধ্যে এইসব জেলা ও আঞ্চলিক পাঠকেন্দ্রের একটি প্রধান কাজ পত্রালাপ বা করেসপণ্ডেন্স্ কোর্সের উপযোগী পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি রচনা করা। করেসপণ্ডেন্স কোর্সের মারফৎ শিক্ষাদান আজ বিশেষজ্ঞগণের চেষ্টায় এক অতি সুন্দর ও সহজ পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে।

পত্রালাপের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর যাবতীয় সমস্যা ও অসুবিধার সমাধান সম্ভবপর হইতেছে। পত্র-আদানপ্রদান দ্বারাই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গৃহীত হয়। করেসপণ্ডেন্স কোর্স জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডাও যথেষ্ট হইয়া থাকে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, বেতারবার্তা এবং মিল-কারখানায় বহুল-প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি ও বুলেটিনের সাহায্যে

করেসপণ্ডেন্স কোর্স-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য জনসাধারণের গোচরীভূত করা হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে জনশিক্ষা-প্রসারে রাশ্যার করেসপণ্ডেন্স কোর্স এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

সোভিয়েট দেশে জনশিক্ষা-প্রসারে আর একজাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ খুব উল্লেখযোগ্য। এইগুলির নাম প্রাপ্তবয়স্কদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Adult Secondary School)। এইসব স্কুলের প্রত্যেকটিতেই বিজ্ঞান-শিক্ষার সুব্যবস্থা রহিয়াছে। সোভিয়েট প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিজ্ঞানবিশেষজ্ঞদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে সবার উপরে। স্ট্যালিনের ভাষায় Personnel are the lynch-pin of a country। কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র ও শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত কর্মীদের পরবর্তী শিক্ষার জন্যই মুখ্যতঃ এডাল্ট সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

বিজ্ঞান-শিক্ষা ছাড়াও এই সব বিদ্যালয় প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার উপযোগী করিয়া তোলে। এই সকল বিদ্যালয়ে রাত্রিতেই পড়াশুনার কাজ হয়। ছাত্রছাত্রীগণের অধিকাংশই শ্রমিক, কেরানী, মিস্ত্রী ও কৃষকশ্রেণীর।

প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শহরে আছে নৈশ বিদ্যালয়। এই সব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ বিদ্যালয়ে অধীত সব কিছু বিষয়েরই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট শিক্ষাকর্তৃপক্ষ সাক্ষাৎভাবে এই নৈশ বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করিয়া

থাকেন। এই রকম একটি বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী, লেবরেটরি ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ সবই আছে, উপরন্তু উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন পূর্ণবেতনভোগী শিক্ষকমণ্ডলীও নিযুক্ত আছেন।

নৈশ বিদ্যালয়ের কোর্সগুলি সাধারণতঃ চার কিংবা পাঁচ বৎসরের। শেষ বৎসরে পরীক্ষা-প্রস্তুতির জন্য মিল-ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ছাত্রছাত্রীগণ তিন-চার মাসের পূর্ণ অবকাশ পাইয়া থাকে। সোভিয়েট রাশ্যার বর্তমান শিল্প-বিশেষজ্ঞগণের অনেকেই এই সব নৈশ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।

গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি-শিক্ষার জন্য বহু একাডেমি স্থাপিত হইয়াছে। শিল্পবাণিজ্য ও কৃষি-ক্ষেত্রে যে-সকল কর্মী নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে এবং যাহাদের ভিতর ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের আভাস পরিলক্ষিত হয়, প্রধানতঃ তাহাদের শিক্ষণের উদ্দেশ্যেই এই একাডেমিগুলি স্থাপিত। একাডেমিগুলিতে যোগদান করিবার জন্য ইহাদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। পাঁচ-ছয় বৎসর সম্পূর্ণ বিনা খরচে ইহারা এইসব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করিতে পারে এবং এই সময়ের জন্য ইহাদের পরিবার-পরিজন ও প্রতিপাল্যগণের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকারই বহন করিয়া থাকে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এইসব একাডেমিতে ভাষা ও সাহিত্য এবং জাতীয় ইতিহাস অবশ্য পঠনীয়।

সরকারী শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আধা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বয়স্কশিক্ষা-একাডেমি পরিচালনা করিয়া থাকে। এই একাডেমির শিক্ষা

সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখিকা Beatrice King-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য—

Chiefly they take the course just to improve themselves as people, to give the fuller and richer content to life which Knowledge and the ability to appreciate great cultural heritage of mankind make possible.

রাশ্যার জনশিক্ষা-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই আন্দোলনের সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী যাবতীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, সরকারী কর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং সর্বোপরি জনসাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা। গ্রাম্য পাঠশালার নিম্নতম শিক্ষিকা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পদারূঢ় অধ্যাপক পর্যন্ত সকলেই কমবেশী বয়স্কশিক্ষার কাজে নিয়োজিত। পল্লী-অঞ্চলগুলিতেই আবার এই আন্দোলন অধিকতর ক্রিয়াশীল। গ্রাম্য সোভিয়েট পঞ্চায়েৎ এবং যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের (Collective Farms) কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সবিশেষ তৎপর। আক্ষরিক শিক্ষা হইতে সুরু করিয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা পর্যন্ত সব-কিছুই বয়স্ক-পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত।

আজ রাশ্যার লক্ষ লক্ষ লোক দলে দলে এই সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেছে। কী তাহাদের আগ্রহ! কী তাহাদের আন্তরিকতা! তাহারা এ কথা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে যে, শিক্ষার পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়—বাল্যকাল অতিক্রান্ত

হইয়া গেলেও জীবনে আবার যে-সুযোগটি আসিয়াছে, কোন কারণেই তাহা উপেক্ষা করা চলিবে না। জীবনের যে-কোন সময়ই শিক্ষালাভের মাহেন্দ্রক্ষণ।

গ্রাম্য বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রগুলির নামের একটু বিশেষত্ব আছে। এইগুলিকে সাধারণতঃ 'পাঠকুটীর' বা 'Reading Hut' বলা হয়। গ্রামগুলির আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ খুব সচ্ছল নয়। গ্রাম্য স্কুলগৃহটির অবস্থাও তেমন পরিপাটী হইতে পারে না। কাঠ-খড়ের তৈয়ারি ছোট ছোট ঘরই গ্রাম্য বয়স্কশিক্ষার কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই কেন্দ্রগুলির প্রাণশক্তির মূল উৎস হইতেছে স্থানীয় শিক্ষক বা শিক্ষিকা। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সংগঠনশক্তি ও দেশপ্রাণতার উপর নির্ভর করিতেছে জনশিক্ষা-আন্দোলনের সাফল্য। জাতীয় পুনর্গঠনে শিক্ষাব্রতীর অবদান সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় রিডিং-হাটগুলি কর্মমুখর হইয়া উঠে। এই সময়েই গ্রামের কর্মব্যস্ত চাষী-মজুরগণ এখানে আসিয়া সমবেত হয়। আবার গৃহিণীবৃন্দের সুবিধার জন্য বৈকালেও রিডিং-হাটগুলির কাজ চলে। গ্রামের যাবতীয় আনন্দানুষ্ঠান—সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় এই রিডিং-হাটেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

গ্রাম্য রিডিং-হাটের অনুকরণে আবার প্রায় প্রত্যেক শহরেই সংস্কৃতি-মন্দির বা Houses of Culture স্থাপিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই বিষয়ে খুব উদ্যোগী। শহরের পার্ক বা উদ্যানগুলিকে জনশিক্ষার কাজে নানাভাবে

ব্যবহার করা হইতেছে। মস্কো শহরের Gorky Park of Culture and Rest এইরূপ একটি সুবিখ্যাত জনশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

জনশিক্ষা-প্রসারে সোভিয়েট দেশের লাইব্রেরীগুলি যে বিরাট অংশ গ্রহণ করিতেছে, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য। শহর অপেক্ষা পল্লী-অঞ্চলেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর সক্রিয়। আমাদের দেশে লাইব্রেরী বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি কতকগুলি পুস্তক ও পত্রিকার সংগ্রহ। কিন্তু প্রগতিশীল লাইব্রেরী কেবল পুস্তক-সংগ্রহই নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে একটি কর্মচঞ্চল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ইহার কাজ হইতেছে যে-কোন স্কুল-কলেজের অনুরূপ। অর্থাৎ লাইব্রেরীর কাজ কেবল বই ইস্যু (Issue) করা আর রিটার্ণ (Return) নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। লাইব্রেরীগুলি হইতেছে শিক্ষা-বিষয়ে বিবিধ আলোচনা ও বক্তৃতার স্থানীয় কেন্দ্র, অধ্যয়ন ও গবেষণাগার এবং সংবাদ-ব্যুরো (Information Bureau)। সোভিয়েট রাশ্যার গ্রন্থাগারগুলি মোটর-ভ্যানের সাহায্যে দূরান্তের নিভৃত পল্লীর অধিবাসীগণের মধ্যেও নিয়মিতরূপে পুস্তক-পত্রিকা সরবরাহ করিতেছে।

জনশিক্ষা-আন্দোলনের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে চলচ্চিত্র, বেতার, সংবাদপত্র এবং পুস্তক-মুদ্রণ ও প্রকাশ—এর প্রত্যেকটি আজ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। সংখ্যা, পরিমাণ ও গুণাগুণের দিক দিয়া পুস্তক-মুদ্রণের কাজ অভাবনীয় উন্নতি

লাভ করিয়াছে। পুস্তকের মূল্য আজ আর সর্বসাধারণের সাধ্যাতিরিক্ত বলা চলে না।

জনশিক্ষা-আন্দোলনের এই অপূর্ব সাফল্যের চিত্রটি Kazakh Steppes-এর কবি Jambul-এর ছন্দে সুন্দর রূপায়িত হইয়াছে :

"In the dust lies czardom, the tottering lame,
That stifled the people in darkness and
shame ;
And twenty swift years did since supervene,
Of magic creation transforming the scene."

জনশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগার

নির্ঝরের সঙ্গীত এবং মহাসমুদ্রের কল্লোল-ধ্বনি যদি কোন যাদুমন্ত্রে স্তব্ধ হইয়া একটা শান্ত অচঞ্চল রূপ পরিগ্রহ করে, তবে একমাত্র তাহারই সহিত গ্রন্থাগারের স্বরূপ উপমিত হইতে পারে। গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এইরূপ একটি অনবদ্য উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মননশক্তিই আমাদের চরম ও পরম শক্তি। ছাপার অক্ষরের শৃঙ্খলে এই দুর্জয় শক্তিকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সেই অপরিমেয় শক্তির আধার, মানুষের কল্পনা ও চিন্তার শ্রেষ্ঠ ফলরাজির অতুল্য সঞ্চয়। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার একাধারে শ্রুতি ও স্মৃতি, ঐতিহ্য ও অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা। যুগে যুগে মানুষের মনোরাজ্যে যে বিপ্লব-বিলোড়ন ঘটিতেছে, মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে-বিবর্তন হইতেছে, তাহার খণ্ড বা অখণ্ড, একক বা সমগ্র পরিচয় লিপিমালায় বিধৃত হইয়া রহিয়াছে গ্রন্থরাজির নিরাপদ আশ্রয়ে। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার মানুষের মননশক্তির আধার, উৎস ও বিকিরণ-কেন্দ্র। শিক্ষার প্রসার ও সংস্কৃতির সংবর্ধনে গ্রন্থাগারের যে-অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা রহিয়াছে, কী উপায়ে সেই শক্তিকে জাতীয় জীবনের পরিস্ফুরণে সজীব, সক্রিয়, সুফলপ্রসূ করিয়া তোলা যায়, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের ইতিহাস কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনী এক্ষেত্রে বহুলাংশে অপ্রাসঙ্গিক। কাজেই সে-আলোচনা না করিলেও ক্ষতি নাই। বর্তমান যুগের অর্থাৎ উনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই দেখা যায় যে, ভারতের নব সাধনার পাদপীঠ কলিকাতায় কার্যকারণ-পরম্পরাগত না হইলেও ইংরাজী শিক্ষা-প্রচলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরি বা জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। দেশে সর্বপ্রথম কোথায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধের অবকাশ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, মেদিনীপুর জেলাতেই নাকি প্রথম জনসাধারণের গ্রন্থাগার (Public Library) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যেই দেখা যায় যে, ইংরাজী-শিক্ষার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্রই বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা এবং মহকুমা শহরে তো বটেই, এমন কি বর্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রামেও লাইব্রেরি-স্থাপনের উদ্যোগ চলিতে থাকে। বিগত স্বদেশী-যুগের গঠনমূলক কার্যসূচীর মধ্যে গ্রন্থাগার-স্থাপন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। আমরা জানি যে, অগ্নিযুগের কর্মিগণ নানাস্থানে তাঁহাদের গুপ্ত কর্মকেন্দ্রসমূহে ছোট ছোট গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া তদানীন্তন তরুণ সম্প্রদায়কে বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেন। শিক্ষা-বিস্তারে দেশের গ্রন্থাগারগুলির অবদান অপরিসীম।

আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রায় সার্ধদ্বিসহস্র লাইব্রেরি আছে বলিয়া একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া গিয়াছে। এই আড়াই হাজার লাইব্রেরির বেশির ভাগই অবশ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ স্কুল-কলেজের সংলগ্ন। এই লাইব্রেরিগুলি স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণের ব্যবহারের জন্যই নির্দিষ্ট—ইহাদের দ্বার সর্বসাধারণের নিমিত্ত অবারিত নহে। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা জনসাধারণের গ্রন্থাগার বা পাবলিক লাইব্রেরি বলিব না। এইগুলিকে বাদ দিয়াও কেবল পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যাও পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক দেড় হাজার হইবে। এই সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা নির্ভুল নহি, কারণ, কোন সঠিক গ্রন্থাগার-পরিসংখ্যান এতাবৎ সংগৃহীত হয় নাই। আমাদের অনুমান, সমগ্র দেশে ছোট-বড় লাইব্রেরির সংখ্যা আরও অধিক হইবে।

এই লাইব্রেরিগুলি সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপত্তি ও সংস্থিতি বহুলাংশেই স্বতঃস্ফূর্ত। ব্যক্তি-বিশেষের দান-দাক্ষিণ্য বা জন-সাধারণের সমবেত উদ্যমেই এই জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব হইয়াছে। সরকারী বা আধা-সরকারী তহবিল হইতে লাইব্রেরিগুলি এ পর্যন্ত খুব সামান্য পৃষ্ঠপোষকতাই লাভ করিয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা—যথা, কলিকাতা কর্পোরেশন, জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি স্থানে স্থানে পাবলিক লাইব্রেরির জন্য কখনও কখনও কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা যতদূর

জানি, খাস সরকারী কোষাগার হইতে ১৯৫০ সনের পূর্ব পর্যন্ত পাবলিক লাইব্রেরিগুলিকে সাহায্য দিবার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। ১৯৫০-৫১ আর্থিক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগ, বোধ হয় শিক্ষা-বিভাগের ইতিহাসে সর্ব-প্রথম, পাবলিক লাইব্রেরিগুলির জন্য মোট ৭৬,১০০৲ টাকা বরাদ্দ করেন। লাইব্রেরিসমূহের মোট সংখ্যা ও তাহাদের প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় এই অর্থ যথেষ্ট না হইলেও ইহা জাতীয় শিক্ষা-প্রচেষ্টায় এক অভিনব এবং অভিপ্রেত সূচনা। ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনস্বীকার্য। এই ব্যয়-বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহারই ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীণ সংগঠন-প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে লাইব্রেরির মাধ্যমেই জনশিক্ষার সর্বজনীন প্রসার সম্ভবপর হইয়াছে। এদেশেও সেই একই নীতির অনুসরণ অপরিহার্য।

এখন হইতে একশত বৎসরেরও পূর্বে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডে প্রথম গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই আইনের বলে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের (Local Education Authority) উপর জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত আইনে পূর্ববর্তী আইনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হয় এবং ইহার কার্যকারিতা সম্প্রসারিত হয়। সংক্ষেপে ১৯১৯ সনের সংশোধিত আইনের মূল কথা হইল:

(১) সাধারণের গ্রন্থাগার-গৃহে স্থানীয় সামাজিক ও

সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সভাসমিতির জন্য স্থান-সংরক্ষণ। অর্থাৎ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ (Local Education Authority)-পরিচালিত গ্রন্থাগার-গৃহে অন্যান্য সোসাইটি বা সমিতির অধিবেশন হইবার ব্যবস্থা।

(২) গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণের নিকট জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ-আয়োজনের ক্ষমতা-প্রদান।

ইহার পর আসিল ১৯৪৪ সনের সুবিখ্যাত Education Act বা শিক্ষা আইন। এই আইন অনুসারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় বয়স্ক-শিক্ষাকেও সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহা দ্বারা স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের উপর স্কুল-এজ্ (School-age) বা বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের বালক-বালিকা অপেক্ষা অধিকতর বয়স্ক প্রত্যেক নরনারীর জন্য পরবর্তী শিক্ষা (Further education)-ব্যবস্থার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্থানীয় প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণের উপযোগী সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা (Cultural training) এবং স্বাস্থ্যকর আনন্দময় পরিবেশে অবসর-বিনোদনের (leisure & recreative activities) ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডের মতো প্রগতিশীল দেশেও আজ প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় জনশিক্ষাকেও সর্বজনীন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এই সর্বজনীন জনশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে দেশের সংখ্যাতীত গ্রন্থাগারসমূহ।

আজ আমাদের সারা দেশব্যাপী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে। আজ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য গভর্ণমেণ্ট সমাজশিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজশিক্ষা, চাই কি শিক্ষা-বিষয়ক যে-কোন পরিকল্পনাকেই সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে জনশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ গ্রন্থাগার-গুলির বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন আবশ্যক। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যমে যেটুকু সম্ভবপর হইয়াছে, সেটুকু লইয়া নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত লাইব্রেরি-আন্দোলন অভীপ্সিত সাফল্য-লাভ করিতে পারে না। জাতীয় শিক্ষা-পুনর্গঠনের সহিত ইহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কাজেই, অপ্রতুল হইলেও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য যে-আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করিতেছেন, উহাকে শুভ সূচনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সরকারী প্রয়াস কেবলমাত্র পাবলিক লাইব্রেরি-গুলিকে কিছু সাহায্য দিয়াই শেষ হয় নাই। ১৯৪৯ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে গভর্ণমেণ্ট সমাজশিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিটি জনশিক্ষাকেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত একটি করিয়া লাইব্রেরি বা পাঠাগার স্থাপন করাও উক্ত পরিকল্পনার অন্যতম কাজ। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রায় এক হাজার জনশিক্ষা-কেন্দ্রে পাঠাগার-স্থাপন বাবদ বৎসরে আনুমানিক ৬০ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই পাঠাগারগুলি-স্থাপনের উদ্দেশ্য সদ্য-সাক্ষর নরনারীর পরবর্তী শিক্ষার ব্যবস্থা

করা। এই পাঠাগারগুলির যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে চাই জনশিক্ষার উপযোগী সাহিত্য। এইরূপ সাহিত্যের আজ বিশেষ অভাব। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের ন্যায় এদেশেও জনশিক্ষা-আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এ-জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে।

আবার প্রতি ৪।৫টি জনশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া বিশেষভাবে নির্বাচিত পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতেও সরকারী তহবিল হইতে বার্ষিক প্রায় ৪৫,০০০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেশের লাইব্রেরিগুলির উন্নতি ও সমৃদ্ধি-সাধনের প্রতি শিক্ষা-বিভাগ উদাসীন নহেন। জন-সাধারণের মধ্যেও একটা জাগরণের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বহু দূর-দূরান্তের নিভৃত পল্লী হইতেও সাড়া আসিতেছে। শতসমস্যা-খিন্ন জীবনযাত্রার নানা দৈন্য-দুর্দশা অগ্রাহ্য করিয়াও শিক্ষাভিলাষী জনসাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন ও সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতেছেন। ইহা বাস্তবিকই সুলক্ষণ।

আধুনিক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বা Library Science একটি বহুল-আলোচিত বিষয়। গ্রন্থাগারের সংগঠন, পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে অধুনা বহু গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে। কিভাবে গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠুভাবে জনশিক্ষার কাজে লাগানো যায়, ইহা লইয়া নানারূপ এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা চলিতেছে। ইংলণ্ডের লাইব্রেরি-আন্দোলনের সামান্য একটু আভাস দিয়াছি। ডেনমার্ক,

সুইডেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিক্ষায় অগ্রসর দেশসমূহেও লাইব্রেরি-আন্দোলন এক বিরাট ও ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সর্বত্রই গ্রন্থাগারগুলিকে জনশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা হইতেছে।

লাইব্রেরি-স্থাপন ও পরিচালনা-বিষয়ে আজ কোন মত-দ্বৈধের অবকাশ নাই। এমন এক সময় ছিল, যখন গ্রন্থাগার ছিল ধনীর গৃহসজ্জার অঙ্গস্বরূপ। সুন্দর, সুদৃশ্য ও মহার্ঘ পেটিকায় সযত্নে আহৃত ও রক্ষিত মূল্যবান গ্রন্থরাজি জন-সাধারণের উপযোগী কিনা এবং উপযোগী হইলেও তাহা প্রকৃতই জনসাধারণের ব্যবহারে লাগিল কিনা, সে-বিষয় ছিল গৌণ। বোধ হয় এই জাতীয় শৌখিন গ্রন্থাগারগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়া থাকিবেন :

> "পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত
> মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি' পঞ্চহাজার গ্রন্থ,
> সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
> অস্বাদিত মধু যেমন যূথি অনাঘ্রাতা।"

ধনীর শৌখিন সরঞ্জামরূপে লাইব্রেরির দিন ফুরাইয়াছে। আজ লাইব্রেরিগুলি কেবল উচ্চাঙ্গের গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানই নহে, পরন্তু উহারা হইতেছে জনশিক্ষার প্রাণচঞ্চল কেন্দ্র।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে সর্বজনীন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জনসংখ্যার অধিকাংশই শিক্ষা-সোপানের সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত আরোহণ করিবার সুযোগ

হইতে বঞ্চিত থাকে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিতের দল বিদ্যালয়ের দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও পরবর্তী জীবনে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া থাকে—এই গ্রন্থাগারগুলির কল্যাণে। গ্রন্থাগারের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলির সংগঠন-কৌশল এবং পুস্তক-সংগ্রহ এতই সুচিন্তিত যে, অঞ্চলের প্রতিটি পাঠেচ্ছু নরনারীর মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে উহা যথেষ্ট। লাইব্রেরি-স্থাপনের পূর্বে বা পরে একটি আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ বা সার্ভে করিয়া দেখিয়া লওয়া হয় যে, সেই অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠানুরাগী পাঠকগোষ্ঠী বা reading groups-এর সংখ্যা কিরূপ? এই সার্ভের ফলাফল হইতে ইহাও নির্ধারণ করিয়া লওয়া হয় যে, এই পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা বা প্রয়োজন কি এবং সেই অনুসারেই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। জনশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানস্বরূপ এই লাইব্রেরিতে নাটক, নভেল-জাতীয় পুস্তক অপেক্ষা কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের পুস্তক-পত্রিকার সংখ্যাই থাকে বেশী এবং এই পুস্তক-পত্রিকার রচনা-ভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর অবতারণাও হয় ঠিক পাঠকগোষ্ঠীর প্রকৃত প্রয়োজন এবং যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। পুস্তক-নির্বাচনের ব্যাপারে একটি মূলসূত্র অবলম্বিত হইয়া থাকে। For every reader a book and for every book a reader—প্রত্যেক পাঠকের উপযোগী বই এবং প্রত্যেক বইয়ের যোগ্য পাঠক—ইহাই হইল এই মূলসূত্র। কেবল পুস্তক সংগ্রহ করিলেই লাইব্রেরি-পরিচালনার

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা যেরূপ লৌহ আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ পাঠককে আকৃষ্ট করাও লাইব্রেরির অন্যতম কাজ। লাইব্রেরির বইগুলির শ্রেণীবিভাগ বা classification এবং সুবিন্যাস বা display পাঠককে আকর্ষণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। মণিহারী দোকানের মালিক যেমন কাচের আলমারিতে তাহার পণ্যসম্ভার সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করিয়া ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করে, লাইব্রেরিতেও সেইরূপ পন্থায় পাঠককে আকৃষ্ট করিবার বহুবিধ উপায় আছে। লাইব্রেরি-বুলেটিন, প্রচার-পত্র, গ্লাস-কেস, ছবি, হ্যাণ্ডবিল, আলোচনার আসর প্রভৃতি লাইব্রেরিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার অনুমোদিত পন্থা। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে চলচ্চিত্র, রেডিও প্রভৃতিও লাইব্রেরি-আন্দোলনের সহায়করূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠকের রুচি-অনুসারে পাঠ্য-বিষয়াদির নিয়মিত নির্ঘণ্টও প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং সেই নির্ঘণ্ট বা Index নিয়মিত পাঠকের নিকট প্রেরিত হয়। পাঠকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকের তালিকা বা Catalogue-রচনার বিষয়েও নানা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হইতেছে। স্থিতিশীল ও ভ্রাম্যমান—দুইপ্রকার লাইব্রেরিরই আজকাল প্রচলন হইয়াছে। চলমান লাইব্রেরির জন্য মানুষ, অশ্ব, উট, গো-গাড়ী, অশ্ব-বাহিত শকট, মোটর-ভ্যান, নৌকা ইত্যাদি নানা প্রকারের বাহন নিয়োজিত হইতেছে।

আধুনিক গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি ও কর্মপরিধি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থাগারিক কেবলমাত্র গ্রন্থের রক্ষকই (Keeper of books) নহেন। গ্রন্থাগারগুলি হইতেছে নানা বিষয়ের সংবাদ-সরবরাহ-কেন্দ্র বা Information Bureau। গ্রন্থাগারিক হইতেছেন সেই ব্যুরোর প্রধান সংবাদ-পরিবেশক। তিনি একাধারে শিক্ষক, সংগঠক, বক্তা এবং সংবাদদাতা। এবংবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্ব-গ্রহণের যোগ্যতা-অর্জনের পূর্বে একজন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে কেবল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-পড়া বিদ্যালাভই যথেষ্ট নহে। বিদ্যালয় বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়াও তাঁহাকে কমপক্ষে ৩।৪ বৎসর শিক্ষানবিশি করিতে হয়। ট্রেণিং ব্যতীত গ্রন্থাগারিকের পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণে কেহ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন না। গুরু-দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা এবং আর্থিক অবস্থারও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁহার সামাজিক পদমর্যাদা এবং তাঁহার আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া সর্বজনস্বীকৃত জননেতা বা কম্যুনিটি-লীডার। তিনিই জন-শিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্মী।

পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় আমরা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছি বলিয়াই নৈরাশ্যবাদী হইতে হইবে, এরূপ কথা ঠিক নহে ; পশ্চাৎপদ একদিন অগ্রগামী

হইবে, অগ্রগামী আরও অগ্রসর হইবে। চরৈবেতি চরৈবেতি। ক্রমাগত আগাইয়া যাওয়াই মানুষের ধর্ম। দিকে দিকে জাতীয় জীবনের অগ্রগতিরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ; আজ বিশ্বাসের সহিত, নিষ্ঠার সহিত, সঙ্কল্পের সহিত জাতির এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। দেশের শিক্ষিত ও সক্ষম ব্যক্তি-মাত্রকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশজোড়া অশিক্ষার অন্ধকার ঘুচাইবার দায়িত্ব তাঁহারই নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শিক্ষাপ্রসারে রেডিও

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগে দৈববাণী ও আকাশবাণীর খুব রেওয়াজ ছিল। আজকাল আমরা বিশ্বাস ও বিস্ময়ের যুগ কাটাইয়া বাস্তবের যুগে উপনীত হইয়াছি। নিভৃত গৃহকোণে শত-সহস্র যোজন দূরাগত ঈথার-তরঙ্গ-বাহিত বেতার-ধ্বনি আজ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-সাধন করিতেছে। রেডিও বা বেতার বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক প্রগতির একটি স্মরণীয় অবদান। আজ রেডিওর প্রসাদে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। দুর্গম গিরি-কান্তার-মরুর দুস্তর বাধাও অতিক্রান্ত হইয়াছে। কবির কথায় দূর হইয়াছে নিকট বন্ধু।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু এবং মার্কনি যখন প্রথম বিনা তারে বার্তা পাঠাইবার কৌশল আবিষ্কার করেন, তখন ইহার ব্যবহার মুখ্যতঃ সংবাদ-আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে জার্মাণীর সমরাঙ্গনে ব্রিটিশপক্ষীয় মিত্রশক্তি ইহার ব্যবহার আরম্ভ করে। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেতার-যন্ত্রের অন্যান্য ব্যবহারও চলিতে থাকে। বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বেও রেডিও বা বেতার-যন্ত্র সংবাদ-সরবরাহ অথবা আনন্দ-বিধান ও অবসর-বিনোদন ব্যতীত অপর কোন কাজে বড় একটা ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইত না।

আজকাল রেডিও অনেকটা গৃহস্থের সাধারণ গৃহসজ্জা বা আসবাবপত্রের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাসাদ-বাসী ধনাঢ্য এবং সামান্য পান-বিড়িওয়ালা, পারিলে সকলেই একটি রেডিও-যন্ত্র রাখে। সর্বজনীন পূজা-উৎসবাদিতে অ্যাম্প্লিফায়ার-সহযোগে রেডিও-সঙ্গীতের উচ্চকিত নিনাদে

শহরের পাড়াগুলি কোলাহল-মুখর হইয়া উঠে। ঘরে ঘরে রেডিও, দোকানে দোকানে রেডিও—চারিদিকেই রেডিওর ছড়াছড়ি। নানা প্রয়োজনে ও নানা উদ্দেশ্যে আজকাল এই জনপ্রিয় যন্ত্রটি ব্যবহৃত হইতেছে।

সংবাদ-সরবরাহ এবং অবসর-বিনোদন বা আনন্দ-বিধান ছাড়া যে আরও একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে রেডিওর ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইল শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ। অবসর-বিনোদনকল্পে রেডিও মারফৎ যে সঙ্গীত, নাটকাভিনয় ও সংলাপ শুনা যায়, শ্রোতার মনের উপর তাহার শিক্ষামূলক প্রভাব অবশ্যই রহিয়াছে। আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়াও রেডিওর শিক্ষামূলক প্রভাব অনুভূত হয়। কিন্তু এই প্রভাব পরোক্ষ।

আরও প্রত্যক্ষ বা সরাসরিভাবে কি উপায়ে রেডিওকে শিক্ষাপ্রসারের কাজে লাগানো যাইতে পারে, সে-বিষয়ে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ চিন্তা করিতেছেন। রেডিও-যন্ত্রটিকে শিক্ষাদান-কার্যে নিয়োগ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত লোকের মনে কয়েকটি বিশেষ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে একটি বাতিক (Fad)-বিশেষ বলিয়া মনে করেন এবং বলেন যে, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। অনেকে অবার রেডিওর শিক্ষাবিষয়ক সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে একান্তই অজ্ঞ বা উদাসীন। তৃতীয় একদল মনে করেন যে, রেডিও দ্বারা শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিপ্লব বা এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে। অপর পক্ষে এক শ্রেণীর লোকের মতে রেডিও-যন্ত্রটি শিক্ষাদানের

একটি চমৎকার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথমোক্ত অভিমত-সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার সময় এখনও হয় নাই। রেডিও-ব্যবহারের উদ্দেশ্য বাস্তবিকই ব্যর্থ হইবে কিনা, একমাত্র ভবিষ্যৎই ইহা বলিতে পারে। দ্বিতীয়োক্ত অভিমত সম্বন্ধে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, রেডিও-যন্ত্রের প্রসাদে শিক্ষাক্ষেত্রে এক অভাবনীয় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। শিল্প-বিপ্লবের ফলে বহুক্ষেত্রে উটজ শিল্প বা হস্তশিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে কলকারখানা বা বৃহত্তর শিল্প এবং মানুষ-কর্মীর স্থান লইয়াছে যন্ত্র। বিদ্যালয়ে রেডিও-যন্ত্র চালনা করিয়া শিক্ষককে অবসর দেওয়া যাইতে পারে, এইরূপ মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। রেডিও আর যাহাই করুক, শিক্ষককে বেকার বানাইতে পারিবে না, ইহা অতি সত্য কথা। শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন এবং ব্যক্তিগত সমস্যার নানা চাহিদা মিটাইতে, শিক্ষকের উপস্থিতি, সাহায্য ও প্রভাব অপরিহার্য। ছাত্রের মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ-সাধনে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অসামান্য। যন্ত্র-নির্গত শব্দ শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের বিকল্প হইতে পারে না। কাজেই যাঁহারা মনে করেন যে, রেডিও-যন্ত্র ক্লাসরুম-শিক্ষকের স্থান অধিকার করিয়া শিক্ষাদান-ব্যাপারে এক যুগান্তর আনয়ন করিবে, তাঁহারা অহেতুক আশাবাদী।

শিক্ষাদান-পদ্ধতির কোন যুগান্তকারী পরিবর্তন-আনয়নে সমর্থ না হইলেও, শিক্ষকের সহায়করূপে রেডিওর ব্যবহার

ক্রমশঃই ব্যাপক ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষকের সহায়করূপেই রেডিও ব্যবহৃত হইবে, শিক্ষকের বিকল্প-রূপে নহে। স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলির অপূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা-দূরীকরণে সাহায্য করিবে বেতার-বক্তৃতা। প্রচলিত শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সম্পূরক বা complement হইবে বেতার-ভাষণ।

শিক্ষা-বিষয়ক বেতার-ভাষণের উদ্দেশ্য, নীতি এবং বিষয়বস্তু কি হইবে, ইহা নির্ধারণ করিবার ভার ন্যস্ত থাকা উচিত শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক, অভিভাবক এবং শ্রোতা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর উপর। এই বিষয়ে ইহাদের প্রত্যেকেরই সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। শিক্ষাবিদ্ দেখিবেন, যেন রেডিওর মাধ্যমে কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচীর মানের উন্নতিবিধান হয়। শিক্ষা-বিষয়ক নূতন গবেষণার ফলাফল যেন রেডিও মারফৎ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রেডিওর মাধ্যমেই দেশের শিক্ষাব্রতিগণের মধ্যে একটা পারস্পরিক সংযোগ স্থাপিত হইতে পারে। রেডিওর সাহায্যে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, রাজনীতিক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের চিন্তার ফলাফল জনসাধারণের উপকারে প্রচারিত হইতে পারে। দেশ-বিদেশের শিক্ষা-বিষয়ক যাবতীয় খবর যত সহজে রেডিওর মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারিত হয়, তত আর কিছুতেই সম্ভবপর নহে। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ামক ও পরিচালকগণ রেডিও-যন্ত্রটির যথাযথ ব্যবহার করিবেন।

প্রতিদিনের শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ, সরস ও

আনন্দদায়ক করিয়া তুলিতেও রেডিওর সাহায্য গ্রহণযোগ্য। শিল্প, সঙ্গীত, নাটক, ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষণীয় বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষক রেডিওর সাহায্যে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত করিয়া প্রগতিশীল জগতের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন। শ্রোতার পক্ষে স্বকর্ণে তাহার প্রিয় কবি, লেখক, অভিনেতা প্রভৃতির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে এই রেডিও। বিদ্যালয়ে প্রতিদিনের পাঠগ্রহণের একঘেয়েমি-বর্জিত রেডিও-অনুষ্ঠান তাহার পক্ষে যে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা বহন করিয়া আনিবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার রেডিওর প্রোগ্রাম-রচনায় ও প্রচারে শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ অভিভাবকগণও রেডিওর মারফতেই শিক্ষা-পদ্ধতি ও পরিকল্পনার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইতে পারেন। বেতার-ভাষণকে ক্লাসরুম-শিক্ষণের সম্পূরক হিসাবে কাজে লাগাইতে হইলে, বেতার-ভাষণের ভাষা, বিষয়বস্তু, সময়-দৈর্ঘ্য (time-length) ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। বেতার-ভাষণ-পরিচালকের কাজ হইবে কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচীর মান এবং ক্রম-নির্ধারণ, প্রতিটি পাঠ বা ভাষণের দৈর্ঘ্য ও সময়-স্থিরীকরণ এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্য-গ্রহণ।

ক্লাসরুম-শিক্ষকের দায়িত্বও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। যে-কোন বিষয়েই ভাষণের ভূমিকা হিসাবে রেডিও-যন্ত্রটি সরব হইয়া

উঠিবার পূর্বেই তাঁহার কিছু বলা আবশ্যক। ইহার উদ্দেশ্য, রেডিও-কথিত বিষয়টি সম্যক্ বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করা। কাজেই, শিক্ষক মহাশয়কে পূর্বাহ্নেই রেডিও-কথিত বিষয়টির সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে। বেতার-পরিচালক, বেতার-কথক এবং ক্লাসরুম-শিক্ষক—প্রত্যেকের মধ্যেই পূর্ণ সহযোগিতা থাকা আবশ্যক।

বেতার-ভাষণের পরে আবার কথিত বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার্থী শ্রোতাদিগকে আলোচনার সুযোগ দেওয়াও শিক্ষকের কর্তব্য। বেতার-ভাষণটির বিষয়বস্তু এবং কথকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে শ্রোতাদের স্বকীয় মতামত বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিবার অবকাশ না থাকিলে বেতার-শ্রবণ বহুলাংশেই নিরর্থক হইয়া যাইবে।

বিস্ময়কর দ্রুতছন্দে পৃথিবী বৈজ্ঞানিক প্রগতির পথে চলিতেছে। রেডিওর বিস্ময় কাটাইয়া উঠিবার পূর্বেই আমরা টেলিভিশন বা দূরেক্ষণ-যন্ত্রের কথা শুনিতেছি। শুধু দূরাগত সঙ্গীত-শ্রবণ-মাত্রই নহে, সঙ্গে সঙ্গে গান-রত গায়কের চাক্ষুষ দর্শনলাভও টেলিভিশনের প্রসাদে সম্ভবপর হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে রেডিওর ন্যায় টেলিভিশনের ব্যবহারও জনপ্রিয় ও ব্যাপক হইয়া উঠিবে,—আমরা সেইদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক ক্যাণ্টের উক্তি স্মরণ করিতেছি:

"Seeing without understanding is emptiness; understanding without seeing is blindness."

শিক্ষার একাল ও সেকাল

এখন হইতে প্রায় তুইশত বৎসর আগেকার কথা। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয়ের ফলে এদেশে ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে সমগ্র ভারতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া এক বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল, সে-কথা ইতিহাসপাঠক-মাত্রেই জানেন।

আজ তুইশত বৎসর পরে বহু সংঘাত ও সংগ্রামের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারত তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে। এই তুইশত বৎসরের ব্যবধান,—নানা রাষ্ট্র-বিপর্যয় ও সমাজ-বিপ্লবের ভিতর দিয়া ভারতের জাতীয় জীবনে যে-যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং আজ স্বাধীনতা-অর্জনের পর দেশের অর্থনীতি, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, সংস্কৃতি ইত্যাদি বহু বিষয়েই যে-নূতন নূতন পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের আয়োজন চলিয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে হইলে, তুই শতাব্দী পূর্বে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা কিছু ছিল কিনা এবং থাকিলে সে-ব্যবস্থাই বা কিরকম ছিল, আর তুইশত বৎসরের মধ্যে কোন নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল কিনা, এবং আজ কোন্ পথে আমাদের জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন পরি-চালিত হইতেছে, সে-সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের

থাকা উচিত। কারণ, শিক্ষাই সমাজ-জীবনের ভিত্তি এবং শিক্ষাই জাতীয় উৎকর্ষের মাপকাঠি। তাই আজ হইতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে এদেশে ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাতের পূর্বে, এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ছিল, আর আজ স্বাধীনতা-অর্জনের পর আমাদের শিক্ষাধারা কোন্ পথে চলিয়াছে, ইহাই এ-প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

প্রথম ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্তনের যুগে অনেকের মনেই এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ইংরাজ আসিবার আগে এদেশে কোন সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল না, আর যদিও-বা কিছু ছিল, তদানীন্তন শাসকসমাজ এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্যবঙ্গ-সম্প্রদায় সে-শিক্ষার কোন মূল্যই স্বীকার করিত না। এই ধারণার মূলে ছিল ভারত-বিদ্বেষী টমাস ব্যাবিংটন মেকলের উক্তি। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক্ যখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল, সেই সময়ে লর্ড মেকলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ামক হইয়া আসেন। সমগ্র সংস্কৃত এবং আরবী সাহিত্য ও দর্শনের প্রকৃত মূল্য যে ইউরোপীয় ভাষার খানকয়েক গ্রন্থের সমতুল্যও নয়, এই ছিল তাঁহার অভিমত। কিন্তু মেকলের এই উক্তি এবং ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের এই ধারণা ছিল একান্তই ভ্রান্ত।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানব-সভ্যতার আদি পাদপীঠ এই ভারতভূমি তাহার স্বকীয় আদর্শ ও প্রতিভা-অনুসারে সৃষ্ট

একটা বিশিষ্ট শিক্ষাধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের প্রাক্কাল অবধিও সেই শিক্ষাধারাই জাতীয় মানসকে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করিয়া আসিতে-ছিল। জনৈক ইংরাজের জবানীতেই এ-কথার সত্যতা নিরূপিত হয়। উইলিয়ম অ্যাডাম-কৃত 'Reports on the State of Education in Bengal'-নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে খ্রীঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়। দেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থাকে মোটামুটি দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—উচ্চ-শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা।

উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল সংস্কৃত টোল এবং আরবী ও ফার্সী মাদ্রাসা। ব্রাহ্মণ-প্রমুখ উচ্চবর্ণ ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা সংস্কৃত টোলে অধ্যয়ন করিতেন, আর সাধারণতঃ মুসলমান মোল্লা-মৌলবীরাই ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। নবাবী আমলের রাজভাষা আরবী ও ফার্সী অধ্যয়ন করিবার জন্য অনেক হিন্দুও মাদ্রাসায় পড়িতেন। নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থান ছিল যেমন সংস্কৃত-চর্চার প্রধান কেন্দ্র, তেমনি দিল্লী, আগ্রা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বিজাপুর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থানগুলিও আরবী ও ফার্সী-চর্চার জন্য খুবই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই টোল ও মাদ্রাসাগুলিতে সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষার মাধ্যমে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত না। বিজ্ঞান বা গণিতশাস্ত্রের অধ্যয়ন-

অধ্যাপনা এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে আদৌ হইত না। এ-প্রসঙ্গে এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনই বর্তমান ইউরোপীয় তথা বিশ্বসভ্যতার মূল উৎস। যে-সময়ে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি নূতন নূতন জ্ঞান ও বিজ্ঞান-চর্চার ফলে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ নিজেকে তাহার সনাতন শিক্ষাদীক্ষার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়া বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতেছিল।

শুধু উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র টোল এবং মাদ্রাসার উল্লেখ করিলেই সে-সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দেওয়া হয় না। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আপামর জন-সাধারণের জন্য সমগ্র দেশব্যাপী ছিল এক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন। এই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়না, বরঞ্চ সেদিনকার স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজ-জীবনের অঙ্গ হিসাবে গ্রাম্য পাঠশালা বা মক্তবগুলিই ছিল দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামেরই নিজস্ব একটি পাঠশালা থাকিত। উইলিয়ম অ্যাডামের রিপোর্টে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এক বাংলাদেশেই এইরূপ গ্রাম্য পাঠশালার সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। সাধারণতঃ কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বৈঠকখানা বা চণ্ডীমণ্ডপেই পাঠশালা বসিত। আবার কোন-কোন স্থানে গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া পাঠশালার জন্য একখানি ঘরও তৈয়ারি করিয়া

দিত। গুরুমহাশয়ের নিজগৃহেও পাঠশালা বসিত। আসবাব-পত্র ও সরঞ্জামের বাহুল্য ছিল না বলিলেই চলে। ছেলে-মেয়েরা নিজ নিজ আসন সঙ্গে লইয়া আসিত। তালপাতা, কলাপাতা, কিংবা বড় জোর শ্লেট-পেন্সিলেই লেখার কাজ চলিত। তখনকার দিনে ছাপান বই ছিল না। প্রাচীন পুঁথিপত্র সবই হাতে লেখা হইত এবং শেখান হইত মুখে মুখেই। মোটামুটি তিনটি বিষয়ে পঠন-পাঠন চলিত —পড়া, লেখা ও প্রাথমিক গণিত বা শুভঙ্করী, যাহাকে চল্‌তি ইংরেজীতে বলে 3 R'S.। আধুনিক প্রাইমারী সিলেবাসের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, হাতের কাজ ও ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয় সেকালের পাঠশালায় পড়ানো হইত না। পাঠশালাটি ছিল গুরুমহাশয়ের নিজস্ব সম্পত্তি-বিশেষ। তিনিই ছিলেন সর্বময় কর্তা। দিনে দুইবার—সকাল ও বিকালে—পাঠশালা বসিত। পাঠশালার ছুটি-ছাটা সব কিছুই দেওয়া হইত গুরুমহাশয়ের ইচ্ছানুসারে। পাঠশালার অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা, কিন্তু তাই বলিয়া নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় আসা বারণ ছিল না, বরং ধনী, দরিদ্র এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে একই গুরুমহাশয়ের কাছেই পড়িত। পাঠশালায় নিত্য পাঠদান ও পাঠগ্রহণের মধ্যে আধুনিক স্কুলের খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ বা অনুষ্ঠানের কোন বালাই ছিল না। পাঠশালার জীবন ছিল অত্যন্ত নীরস ও একঘেয়ে। গুরুমহাশয় লোকটিও হইতেন

ভারী কড়া মেজাজের। দুষ্ট ও অমনোযোগী ছেলেমেয়ে-গুলিকে শায়েস্তা করিবার জন্য তাঁহার বেতগাছাটি যেন সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। কত অদ্ভুত উপায়েই না তিনি ছাত্রদের সাজা দিতেন—অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে নাড়ু-গোপাল, গাধার টুপি, নাকে খৎ ইত্যাদি নানারূপ শাস্তির রেওয়াজ ছিল। আবার গুরু-মারা বিদ্যায় ছেলেমেয়েরাও বড় কম যাইত না। গুরুমহাশয়কে নাকাল করিরার জন্য কতরকম ফন্দিই না তাহাদের জানা ছিল। অনেক বেয়াড়া গুরুমহাশয়কেই তাহাদের হাতে পড়িয়া বেজায় জব্দ হইতে হইত। পাঠশালাগুলিতে 'সর্দার পোড়ো'-প্রথার চল ছিল। এই 'সর্দার পোড়ো'র অনুকরণেই বিলাতের এলিমেণ্টারি (elementary) স্কুলগুলিতেও pupil teacher বা monitorial system প্রবর্তিত হইয়াছিল।

এই হইতেছে সে-সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার একটা মোটামুটি পরিচয়। তখনকার দিনে অবশ্য আজকালের মত বড় বড় হাই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই ছিল না।

কিন্তু সেদিনকার সেই টোল-মাদ্রাসা বা পাঠশালা-মক্তবে যে-শিক্ষা দেওয়া হইত, জাতীয় জীবনের আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে তাহার ছিল একটা নিবিড় যোগ। জাতীয় মানসের পুষ্টি-সাধনই ছিল সেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অষ্টাদশ শতকে ভারতের ইতিহাসে যে-ঘোর রাষ্ট্র-বিপর্যয় দেখা দিল, তাহার ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ন্যায় সেদিনকার শিক্ষাব্যবস্থাও বিপন্ন হইয়া পড়িল। ছলে, বলে, কৌশলে এই বিরাট

নবলব্ধ রাজত্বের স্থায়িত্ব-বিধানই ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য। দেশের জনসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থা কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তাহাদের ব্যস্ত হইবার কোন কারণ ছিল না। পরন্তু দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও শিক্ষা-বিষয়ে নিরপেক্ষতা অথবা নিষ্ক্রিয়তাই ছিল সেদিনকার ব্রিটিশ-শাসনের মূলনীতি। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলিকাতা মাদ্রাসা-স্থাপনের মূলেও ছিল সেই একই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংস যে আরবী ও ফার্সীর একজন পৃষ্ঠপোষক বা সমজদার ছিলেন তাহা নহে, তিনি চাহিয়াছিলেন, কতকগুলি নূতন চাকুরির প্রলোভন দেখাইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী লোকদের হাত করিতে। প্রথম প্রথম ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে-সব ইংরাজী স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারও মূলে ছিল ঐ একই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি এদেশীয় ইংরাজী-নবীশ কর্মী সৃষ্টি করা।

এই প্রসঙ্গে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বৈদেশিক খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারক বা মিশনারীগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহারাই এদেশের ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনের কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির নাম শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যদিও মিশনারীদের শিক্ষাপ্রসারের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রচার, তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, প্রধানতঃ তাঁহাদের চেষ্টাতেই ব্রিটিশ শাসকবর্গ শিক্ষাবিষয়ে ক্রমশঃ তাঁহাদের

নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পর পর ১৮১৩, ১৮২৩ ও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে-নূতন চার্টার বা সনদ প্রদান করে, তাহাতেই প্রথম এই নীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নিরপেক্ষতার পরিবর্তে এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শাসকবর্গ এক নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য কোম্পানির বাজেটে কিছু অর্থের বরাদ্দও করা হয়।

এই সময়ে একটা বড় প্রশ্ন উঠিল শিক্ষার মাধ্যম অথবা medium সম্বন্ধে।

সনাতন প্রাচ্য শিক্ষা অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সীর চর্চা অথবা নবাগত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, অর্থাৎ ইংরাজীর মাধ্যমে নূতন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা,—এই দুইয়ের কোন্‌টি হইবে এদেশের পক্ষে শ্রেয়—এই নিয়া সেই সময়ে দেশব্যাপী তুমুল বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল। শিক্ষা-বিষয়ে এত বড় প্রবল আন্দোলন এই দুইশত বৎসরের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার হয় নাই।

তদানীন্তন General Committee of Public Instruction-এর সরকারী সভ্যবৃন্দও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমে সনাতনপন্থী বা Orientalist-রাই ছিলেন কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শাসকবৃন্দও ছিলেন অনেকটা তাঁহাদের মতেরই পরিপোষক; কাজেই, নব্যপন্থী বা Occidentalist-দের পক্ষে সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটাইতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

ইহাদেরই উদ্যোগে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ এবং

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ্‌স্ কলেজ স্থাপিত হয়। বাংলা ছাপাখানা, বাংলা সংবাদপত্র ও বাংলা অভিধান প্রভৃতি শিক্ষামূলক বহু কিছু প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই মিশনারীদের প্রতিজ্ঞা ও লোক-হিতৈষণা।

সৌভাগ্যক্রমে দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে এমন কয়েকজন প্রতিভাবান পুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের বিদ্যাবত্তা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শীঘ্রই এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং ইংরাজী ভাষা-শিক্ষাই যে এ-দেশের পক্ষে কল্যাণকর, সে-কথা স্বীকৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শিক্ষানীতিরও পরিবর্তন ঘটে। এই নূতন শিক্ষা-আন্দোলনের যাঁহারা পুরোধা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম অবিস্মরণীয়। কিন্তু এই আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক্ ও লর্ড মেকলের সরকারী সমর্থন। ইংরাজীর মাধ্যমে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষাব্যবস্থা করিলেই ক্রমে ক্রমে সেই শিক্ষা নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া পড়িবে—লর্ড মেকলের তথাকথিত 'Filtration Theory'ই হইয়াছিল সেদিনকার প্রধান শ্লোগান।

আমরা জানি পরবর্তী ঘটনায় মেকলের এই ধারণা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দ্বন্দ্বে সংস্কৃত-আরবী-ফার্সী ইংরাজীর নিকট পরাজয় মানিয়া নিল বটে, কিন্তু

একটা বড় কথাই বিবেচনার বাহিরে থাকিয়া গেল। কথাটা হইতেছে, জনসাধারণের শিক্ষা তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত কি না। ইংরাজী-শিক্ষার অনুকূলে দেশে তখন এক বিপুল কর্মচাঞ্চল্য ও সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে ২০।২৫ বৎসরের মধ্যেই দেশের বহুস্থানে সরকারী ও বেসরকারী অনেকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের প্রেসিডেন্ট স্যার চার্লস উড পার্লামেন্টের নিকট যে-বিখ্যাত স্মারকলিপি বা ডেস্‌প্যাচ পেশ করেন, তাহার সুপারিশ অনুসারে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের নীতি গৃহীত হয় এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন এক উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। কিন্তু এই শিক্ষা-বিস্তারে প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইল মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের লোক—যাহারা ইংরাজী কেতাবী শিক্ষার দৌলতে রাজদরবারে চাকুরি, সম্মান ও অর্থ লাভ করিল। দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোন চেষ্টাই করা হইল না।

অবজ্ঞাত গ্রাম্য পাঠশালাগুলি দুর্দশার চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। ফলে, দুইশত বৎসরের ইংরাজ-রাজত্বে বহু বড় বড় দালানকোঠাওয়ালা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও দেশবাসীর অজ্ঞতা বা অশিক্ষা ঘোচে নাই। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের প্রতি কোন যত্ন নেওয়া হয় নাই বলিয়াই আজ দেশের শতকরা ৮০ জন নরনারীই নিরক্ষর। আর ঠিক এই কারণেই ইংরাজী স্কুল-কলেজে শিক্ষিত সম্প্রদায়

ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের উদ্যোগে এডুকেশন কমিশন নিযুক্ত হয়। তাঁহারাই প্রথম স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান—যেমন, জেলাবোর্ড, লোক্যালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির হাতে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের ভার ন্যস্ত করিবার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাহাতেও খুব বেশী সুফল ফলে নাই। এই এডুকেশন কমিশনের সুপারিশেই কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং ল' কলেজ স্থাপিত হয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন ভারতের ভাইস্‌রয় ও গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের জন্য লর্ড কার্জনের শাসনকাল ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। লর্ড কার্জনের প্রতিভা শুধু রাষ্ট্র-শাসনেই নিবদ্ধ ছিল না—শিক্ষা-ব্যাপারেও তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৪ সনের Indian Universities Act। এই আইনের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির নানা ত্রুটিবিচ্যুতি-দূরীকরণ। কার্জনের আমলে শিক্ষা-ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহার ফলে দেশব্যাপী এক প্রবল জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বিদেশী বস্ত্রবর্জনের ন্যায় বিজাতীয় শিক্ষাবর্জনও ছিল স্বদেশী আন্দোলনের একটা আশু লক্ষ্য।

শ্রীঅরবিন্দের অধ্যক্ষতায় কলিকাতার ন্যাশান্যাল কলেজ ও যাদবপুরের বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট সেদিনকার জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের প্রধান অবদান। ন্যাশান্যাল কলেজ অবশ্য বেশীদিন টিকে নাই, কিন্তু যাদবপুরের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটি সেই জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনেরই একটি গৌরবময় পরিণতি।

ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্তনের সময় হইতে আজ পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যাপারে যে-মূলনীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, সংক্ষেপে সেই নীতি বা পলিসিকে Anglicization বা ইংরেজীয়ানা বলিলে অন্যায় হইবে না। প্রথমতঃ ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থেই এই শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়াছিল। এ-দেশীয় ইংরাজীনবীশ এক কর্মচারী-সম্প্রদায়-সৃষ্টি, খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিস্তার ইত্যাদিই ছিল ব্রিটিশের শিক্ষানীতির মূলসূত্র। দুইশত বৎসরের রাজত্বে নানা অবস্থার বৈগুণ্যে এই নীতির যে একেবারেই পরিবর্তন হয় নাই, এ-কথা বলা যায় না। উল্লেখযোগ্য বহু শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টাও বহুবার হইয়াছে। এই প্রায় দুই-শত বৎসরের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নব জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়গণের অবদানও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

কিন্তু সব-কিছু খতাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রায় দুই-শত বৎসরে শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের অগ্রগতি যেটুকু হইয়াছে, তাহা নামমাত্র। যে-দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন নরনারীই এখনও পর্যন্ত নিরক্ষর, যে-দেশে গড়ে প্রতি পাঁচটি বালক-বালিকার মাত্র একটিও কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের

সুযোগ হইতে বঞ্চিত এবং যে-দেশের মেয়েদের শতকরা চারজনও সামান্য আক্ষরিক শিক্ষা লাভ করে নাই, সে-দেশ তাহার সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গৌরব দিয়াও আজ বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসন দাবী করিতে পারে না।

লর্ড কার্জনের আমলে স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা-প্রচেষ্টার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে মহামতি গোপাল-কৃষ্ণ গোখ্‌লে কর্তৃক তদানীন্তন Imperial Legislative Council-এ আনীত ১৯১০ সনের Free and Compulsory Elementary Education Bill. দুঃখের বিষয়, জনসাধারণের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের অপরিহার্যতা স্বীকার করিলেও গভর্ণমেণ্ট গোখ্‌লের বিলের বিরোধিতা করেন, সুতরাং সে-বিল বিধিবদ্ধ হয় নাই। অবশ্য দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়াই প্রাথমিক শিক্ষাকে আর পূর্বের মত একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এবং সমগ্র শিক্ষা-বাজেটের পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশির ভাগটাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে ব্যয়িত হইবে, এইরূপ নির্দেশ দেন।

১৯১১ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলে শিক্ষা-ব্যাপারে খুব বড় কিছু একটা পরিবর্তন না ঘটিলেও এই সময়ের মধ্যেই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ও হায়দ্রাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আর এ-দিকে স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের সৃষ্টি এই সময়েরই অন্যতম প্রধান ঘটনা।

যুদ্ধান্তে ১৯১৯ সনে স্যার মাইকেল স্যাডলারের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট একাধিক কারণে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে এই কমিশন যে-সব সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে—(১) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপন, (২) মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ-স্থাপন এবং (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবী-স্বীকার। এই রিপোর্টের অব্যবহিত ফলস্বরূপ আলিগড়, রেঙ্গুন, লক্ষ্ণৌ, ঢাকা, দিল্লী, নাগপুর, অন্ধ্র ও আগ্রায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এলাহাবাদ, পাটনা ও ঢাকার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডগুলিও স্যাডলার রিপোর্টেরই প্রত্যক্ষ ফল।

১৯১০ সনে গোখ্‌লের প্রাথমিক শিক্ষা-প্রস্তাবের শোচনীয় ব্যর্থতার পর ১৯২০ সন অবধি প্রাথমিক শিক্ষা-প্রসারের আর কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সনে নূতন শাসন-সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তিত হয় এবং তাহার ফলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধীনে হস্তান্তরিত বিভাগ-রূপে শিক্ষার ভার দেশীয় মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯২০—১৯৩০ সনের মধ্যে ব্রিটিশ-ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। অবশ্য, ইতিপূর্বেই ১৯১৯ সনের আইন-অনুসারে কোন কোন আর্বান বা মিউনি-সিপ্যাল শহরে প্রাইমারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এখন রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন অ্যাক্টের বিধান-অনুসারে

প্রত্যেক প্রদেশেই কোন কোন জেলায় জেলা স্কুলবোর্ড বা জেলা এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপিত হয়। এই বোর্ড বা কাউন্সিলের সভ্যদের অধিকাংশই নির্বাচিত, জনকয়েক গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত। জেলার পল্লীঅঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই বোর্ড বা কাউন্সিলের। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহিত হয় আংশিকভাবে ভূমিরাজস্বের আদায়ীকৃত টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা 'এডুকেশন সেস্' বা শিক্ষা-কর হইতে। আর বাকী টাকাটা আসে সরকারী তহবিল হইতে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ১৪ হাজারের উপরে। ১৯৫৪-৫৫ সনের বাজেটে মোট শিক্ষা-ব্যয়ের সাড়ে সাত কোটি টাকা বরাদ্দের বেশির ভাগ টাকাই প্রাইমারী শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে, দেশের বিপুল জনসংখ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও অকিঞ্চিৎকর। দেশের সমস্ত নরনারীর জন্য অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটুকু করিতে হইলেও বিপুলপরিমাণ অর্থ ও ব্যাপক আয়োজন আবশ্যক। সমস্যাটি যে অত্যন্ত গুরুতর, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার শিক্ষার নামে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত যে-সব প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে—জাতীয় প্রতিভা, আদর্শ বা ঐতিহ্যের দিক দিয়াও তাহার বহুল দোষ-ত্রুটি অনস্বীকার্য। আসল কথা, আমরা এ পর্যন্ত মুখ্যতঃ সরকারী চাকুরি-লাভের সহজ পন্থা হিসাবে যে-আদর্শ-বিহীন ইংরাজী-শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছি, তাহাতে

আর যাহাই হোক, জাতীয় প্রতিভার স্ফুরণ ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ—এ-দু'য়ের কোনটাই সম্ভব হয় নাই। আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত, সে-কথা গভীরভাবে আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীই এ-বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক। মহাত্মাজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় আমরা নূতন পথের সন্ধান পাইতেছি। ভারত সরকার আজ বুনিয়াদী শিক্ষাকেই সরকারী শিক্ষানীতি-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কোন কোন স্থলে উচ্চশিক্ষার আমূল সংস্কারের উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

মহাত্মাজী-প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার মূললক্ষ্য হইতেছে ঃ

(১) সাত বৎসরের জন্য সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ;

(২) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ;

(৩) কেতাবী শিক্ষার পরিবর্তে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা অর্থাৎ সৃজনাত্মক বা গঠনমূলক হাতে-কলমের কোন কাজকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান ; এবং

(৪) শিক্ষার আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা।

প্রাক্-বুনিয়াদী, উত্তর-বুনিয়াদী এবং বয়স্ক-শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে **'নঈ তালিম'** বা নূতন শিক্ষার যে-ব্যাপক

পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আদর্শ বা উদ্দেশ্য হইতেছে ঃ

(১) স্বাস্থ্য ও দৈহিক সক্ষমতা ;

(২) জাতীয় ঐক্যবোধ ;

(৩) সামাজিক সচেতনতা, আর্থিক উন্নতি ও কৃষি-শিল্পের উৎকর্ষ ;

(৪) জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি, এবং

(৫) নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ।

মহাত্মাজী-পরিকল্পিত নঈ তালিমের মূল নীতিগুলি ডাঃ স্যার জন সার্জেণ্টের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনায় এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টা-সমিতির প্রস্তাবেও গৃহীত হইয়াছে।

ডাঃ স্যার জন সার্জেণ্ট যে-পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, ভারতের শিক্ষা-পুনর্গঠনের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা অনুসারেই তাঁহাদের শিক্ষা-প্রোগ্রাম কার্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষার একটি সমগ্র বা অখণ্ড রূপ। জাতীয় শিক্ষার এমন কোন দিক বা সমস্যা নাই, যাহা এই বিরাট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনায় স্থান পায় নাই। সংক্ষেপে এই পরিকল্পনায় আছে ঃ

(১) দেশের পাঁচ বা ছয় বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেকটি বালকবালিকার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ;

(২) প্রাক্-প্রাথমিক বা নার্সারি শিক্ষার ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া যে-সব অঞ্চলে সাধারণের বাসগৃহাদির ব্যবস্থা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়, যেমন শিল্পপ্রধান শহর ও শহরতলীতে ;

(৩) যোগ্যতা অনুসারে বালকবালিকাদের মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান ও প্রচুর বৃত্তিও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ;

(৪) যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাদির সুযোগ-সুবিধা ;

(৫) বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা ;

(৬) জনশিক্ষা ;

(৭) শিক্ষক-শিক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ;

(৮) ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা ;

(৯) শারীরিক ও মানসিক পঙ্গুদিগের উপযোগী বিশেষ শিক্ষা ;

(১০) অবসর-বিনোদনের আয়োজন ;

(১১) Employment Bureau বা কর্মানুসন্ধান বিভাগ-স্থাপন, এবং

(১২) পরিশেষে, প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর হস্তে শিক্ষাব্যবস্থা-পরিচালনার ভার-অর্পণ।

এই সংক্ষিপ্তসার হইতেই বুঝা যায় যে, পরিকল্পনাটি কত ব্যাপক ও সর্বদর্শী। এই পরিকল্পনাটির সফল প্রয়োগের

উপরেই বর্তমান ভারতের শিক্ষা-সংগঠন নির্ভর করিতেছে। ভারতের জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাকে সফল ও সার্থক করিয়া তোলাই আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ভিতর দিয়াই ভারতবর্ষকে তাহার লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে, কবির স্বপ্ন সার্থক হইবে—

"ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

শিক্ষা কোন্ পথে ?

এ-দেশে ইংরাজীশিক্ষার প্রচলন হইয়াছিল প্রধানতঃ ইংরাজ শাসকদের গরজে এবং ইহার মূল উৎস ছিল অর্থকরী ক্ষেত্রে ইহার সম্ভাব্যতা। ইংরাজী শিখিতে পারিলেই ইংরাজ সওদাগরের অফিসে অথবা সরকারী দপ্তরখানায় চাকুরি মিলিত এবং চাকুরির আনুষঙ্গিক সামাজিক পদমর্যাদা ও আরাম-আয়েস সহজলভ্য হইত। ইহাই ছিল ইংরাজীশিক্ষার প্রতি আমাদের আগ্রহের মূল কারণ এবং ইংরাজীতে কে কত চোস্ত বুলি আওড়াইতে পারে, ইংরাজের অনুকরণে কতটা বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে পারে—ইহাই ছিল শিক্ষার মাপকাঠি। ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস ছিল স্কুল-কলেজে অধীত বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ; কেন-না, ইহাদের সাহায্যেই সহজে সাহেবীয়ানা আয়ত্ত করা যাইত এবং বাছা বাছা বুলি ও ধার-করা ভাব প্রকাশ করিয়া বক্তা নিজেকে প্রগতিপন্থী 'ইয়ং বেঙ্গল' বলিয়া জাহির করিতে পারিতেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ইংরাজীশিক্ষা-প্রবর্তনের পর হইতে আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কিছু সময়ের জন্য দর্শন ও সাহিত্য, আবার কখনও-বা অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এমন একটা সময় ছিল, যখন Locke, Mill, Bentham ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরাই ছিলেন আমাদের দেশের শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের আদর্শ; এবং ইঁহাদের উক্তি ও মতবাদ ছিল বেদবাক্যের ন্যায় অকাট্য।

বিষয়বিশেষের প্রতি যে এতটা সাময়িক অনুরাগ বা ঝোঁক, তাহার পিছনেও ছিল এক অর্থকরী গরজ। অর্থাৎ যখন যে-বিষয় পাঠ করিলে চাকুরির বাজারে কদর বাড়িত, তখন সেই-সব বিষয়ের প্রতিই শিক্ষার্থীদের একটা প্রবল প্রীতির ভাব দেখা যাইত। যখন সরকারী চাকুরিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হইল, সেই সময় দেখা গেল যে, বহু ছাত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া I. Sc. কোর্স এবং I. Sc.-র পর B. A. এবং B. A.-তে আবার ইকনমিক্স্ লইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত। ইহার কারণ একমাত্র এই যে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে প্রাথমিক বিজ্ঞান ও ইকনমিক্স্ প্রভৃতি বিষয় জানা না থাকিলে সাফল্যলাভ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চাকুরির বাজার হঠাৎ অভাবনীয়রূপে চাঙ্গা হইয়া উঠিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের অত্যন্ত সমাদর বাড়িয়া গেল। আবার যুদ্ধান্তে দেশব্যাপী পুনর্গঠন-পরিকল্পনার যে হুজুগ উঠিয়াছে, তাহাতে কারিগরী বিদ্যার চাহিদাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বীয় বিষয়াদির সমাদর অনেকটা কমিয়াছে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। আজকাল একজন আনকোরা 'বি.ই.' অথবা 'এম.বি.' অনায়াসেই মাসিক ১০০০৲ টাকা বা ততোধিক উপার্জন করিতে পারে; কিন্তু একজন বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রকৃতই যোগ্য

'এম.এ.' কিংবা 'এম.এ., পি. এইচ-ডি'-র পক্ষেও তাহা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব। অর্থোপার্জনের মাপকাঠিতেই যখন সামাজিক মানমর্যাদা নির্ধারিত হয়, তখন সাধারণ লোকে সহজেই অর্থকরী বিদ্যার দিকেই আকৃষ্ট হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! ইহার ফলে অধুনা দেখা যাইতেছে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও অন্যান্য কলাবিদ্যার ক্লাসগুলি ক্রমশঃই ছাত্রবিরল হইয়া পড়িতেছে, আর অপর পক্ষে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসা-শাস্ত্র, হিসাবপরীক্ষা, কমার্স প্রভৃতি অর্থকরী বিষয়ের ক্লাস-গুলিতে ছাত্রসংখ্যার চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা অবশ্য এক দিক দিয়া খুবই শুভ লক্ষণ ; কেন-না, আমাদের দেশ এখনও বিজ্ঞান ও শিল্প-জগতের অন্যান্য উন্নত দেশ অপেক্ষা বহুল পশ্চাৎপদ। বিজ্ঞান ও শিল্পের অনুশীলন ব্যতীত বর্তমান যুগে একটা জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কাজেই, সে-দিক দিয়া বিচার করিলে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার সমাদর-বৃদ্ধিকে একটা জাতীয় শুভলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, যদিও যে-উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করিয়া এ-দেশের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বা শিল্পবিদ্যা অর্জন করিতে প্রয়াসী হয়, তাহা মূলতঃ বিজ্ঞান বা শিল্পের চর্চা বা উন্নতি-সাধন করা নয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে চাকুরির বাজারে কদর বাড়ানো বই অন্য কিছু নয়। বিদেশে কৃষিবিদ্যায় একটা বড় রকম ডিগ্রী অর্জন করিয়া স্বাধীনভাবে উন্নতধরণের কৃষি-ফার্ম করা অপেক্ষা সরকারী কৃষিবিভাগে একটা বড় চাকুরি পাওয়াই

আমাদের কাম্য। এ-দিকে জাপানীদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই জাপানে ক্রমোন্নতি শুরু হয়। জাপান সরকার দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীকে বিদেশে পাঠান, বেশির ভাগই হাতে-কলমে শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির কাজ শিখাইবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমাদের দেশের বেশির ভাগই বিদেশে যায় কোন একটা ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা আনিবার জন্য; কেন-না, তাহা হইলেই সহজে একটা ভাল চাকুরি জুটিতে পারে। বিদেশের কলকারখানায় বা বাণিজ্যকেন্দ্রে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়া আসিয়া এদেশে স্বাধীন ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কোন শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা খুব কম লোকেই করিয়াছে। অবশ্য এতাবৎ আমাদের বিদেশী শাসকেরাও এ-বিষয়ে কোন উৎসাহ প্রদান করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যের কোন ব্যাপক উন্নতি হইতেই পারে না, ইহা অতি সত্য কথা।

আজ স্বাধীনতা-অর্জনের পর আমাদের শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য—এই উভয়ের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ-আমলে যে-আদর্শবিহীন শিক্ষাধারা এদেশে চলিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহার আমূল সংস্কারসাধন করিয়া তাহাকে একটা সত্যিকার জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিবার দিন আসিয়াছে। আমাদের শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত, সে-কথাটা অতি গভীর চিন্তার বিষয়। শুধু কি অর্থোপার্জনই হইবে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শুধু কি অর্থকরী ও কারিগরী বিদ্যাই

আমাদের মানসিক ও আর্থিক যাবতীয় চাহিদা মিটাইতে পারিবে? শিক্ষার বুনিয়াদ যদি একটা মহৎ আদর্শের উপর স্থাপিত না হয়, তবে জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। যুগধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং যুগাদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া জাতীয় শিক্ষাকে রূপদান করিতে হইবে এবং সুশিক্ষার ভিত্তিতেই স্থাপিত হইবে জাতীয় জীবনের সৌধ।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুগে যুগে বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণে মানব-সভ্যতার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচার না করিয়া সভ্যতার একটা অখণ্ড সমগ্র রূপ কল্পনা করিলে দেখা যায় যে, কোন একটি বিশিষ্ট ভাবধারা বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়াই যুগ-চেতনার আত্ম-বিকাশ ঘটিয়াছে। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার কথাই বলিতেছি। আজও পর্যন্ত ইউরোপই বর্তমান জগতের ভাগ্যনিয়ন্তা,—ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ ও নেতৃত্বই জগৎ মানিয়া চলিতেছে।

অতীতের অন্ধকার হইতে ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় বিবর্তন ও ক্রমে বর্তমান যুগের আকস্মিক আবির্ভাব মানবেতিহাসে একটি চরম বিস্ময়ের বস্তু। তমসাচ্ছন্ন সুপ্রাচীন অতীতের কুহেলিকাজাল বিদীর্ণ করিয়া কবে কিভাবে মানুষ মধ্যযুগের স্বল্পালোকিত প্রাঙ্গণতলে উপনীত হইল, তাহার কোন হদিস ইতিবৃত্ত দেয় না। আদিম তামস যুগ (Dark Ages) হইতে মধ্যযুগে (Middle Ages) transition কোন একটা

নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরায় সাধিত হয় নাই। ইতিহাসের অলক্ষ্যেই একটা যুগান্তর বা পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগ ও তথাকথিত বর্তমান যুগ (Modern Ages)— এ-দু'য়ের মধ্যে আছে একটা বিরাট বিশিষ্ট ব্যবধান এবং এ-দু'য়ের পার্থক্য ও বিভিন্নতা ভাব ও আদর্শের দিক দিয়া অতি সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি বিপ্লবাত্মক ও জগৎ-আলোড়নকারী ঘটনার পটভূমিকায় একটা মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। গ্যালিলিওর আবিষ্কার অথবা কলম্বাসের অভিযান অথবা অন্য কোন ঘটনার সূত্র ধরিয়াই যে এই মহা-যুগান্তর সূচিত হইয়াছে, ইতিহাসে ইহার বহু নজির পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে এ-কথা বলা চলে যে, কতকগুলি বিশেষ ভাবধারা ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় যুগে যুগে মানুষ তাহার চলার পথ অনুসরণ করে এবং সেই ভাবধারার বৈশিষ্ট্যকেই যুগ-চেতনা বা যুগ-আত্মা বলিয়া অভিহিত করা যায়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী—ইতিহাসের এই অধ্যায়কে আমরা বিশ্বাসের যুগ বলিয়া মনে করিতে পারি, কেন-না, দ্বিধাহীন বিশ্বাসই ছিল মানুষের ধর্মজীবনের মূল ভিত্তি— চার্চ বা ভজনালয়গুলিই ছিল সমাজ-জীবনের উৎস-কেন্দ্র ও জাতীয় জীবনের গৌরব। এই ভজনালয়গুলি উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং বিশ্বাসের স্থলে যুক্তি, বিশ্লেষণ, জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান-

স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিল। ইহা বর্তমান যুগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আবার ইহারই অপরিহার্য ফলস্বরূপ মানুষের পার্থিব জীবনে একটা তীব্র লাভ-আকাঙ্ক্ষা (Profit-motive) প্রকট হইয়া উঠিল। মধ্যযুগীয় Craft-Guild বা কারিগর-সমিতির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানির (Limited Company) উদ্ভব হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নানা জাতি অবতীর্ণ হইল এবং সারা বিশ্বে বণিক ও ধনিক-সম্প্রদায়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী শহরগুলি, ইহার নিদর্শন আমেরিকার গগনচুম্বী প্রাসাদসমূহ (Sky-scrapers), সাগর-সংযোজক বিরাট সেতু, রেল, স্টীমার, বিমানপোত, বেতার-যন্ত্র ও সর্বোপরি আণবিক বোমা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কীর্তি। বৈশ্য-শক্তির এই বিশ্বব্যাপী প্রভাবের মূলে আছে এক প্রচণ্ড ক্ষুধা—মুনাফা-প্রবৃত্তি, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণনীতি।

গত উনবিংশ শতাব্দী হইতেই এই মুনাফা-প্রবৃত্তির শূন্যগর্ভতা সম্বন্ধে সচেতনতার আভাস দেখা গিয়াছিল। সাম্যবাদের উদ্গাতা কার্ল মার্কসই এই মুনাফা-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রবল প্রতিবাদ তুলিলেন। একদিকে কম্যুনিজম্ ও অপরদিকে প্ল্যান্ড্ ইকনমি—ইহাই বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহাই মানুষকে তাহার কাম্যবস্তুর সন্ধান দিতে পারিয়াছে কি? সত্য বটে, মুনাফা-প্রবৃত্তির স্থলে প্ল্যানিং-এর প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু প্ল্যানিং-এর যদি একটা

আধ্যাত্মিক ভিত্তি না থাকে, তবে পরিণামে ইহারও একটা উদ্দেশ্যবিহীন গণ-নির্যাতনে পর্যবসিত হইবার সম্ভাবনা।

তাই বোধ হয়, বর্তমান যুগের চিন্তানায়কগণ আবার চলার পথের নূতন ইঙ্গিত দিবার প্রয়াস করিতেছেন। কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদের মন্ত্রগুরুগণ জন্ম-আভিজাত্যের বদলে কর্ম-আভিজাত্যকে মর্যাদা দিয়াছেন—সঙ্কীর্ণ জাতীয়ত্ব-অভিমানের বদলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শ্রেণীসাম্যের আদর্শকে উচ্চস্থান দিয়াছেন বটে, কিন্তু সব-কিছুরই পিছনে এখনও পর্যন্ত একটা আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার অভাব থাকায় সেই পুরাতন materialism বা বস্তুতন্ত্রের প্রভাবই অটুট রহিয়া গিয়াছে। ফলে, সর্বজনকাম্য শান্তি ও সমতা এখনও সুদূরপরাহত। আধ্যাত্মিকতার অভাবে বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা একটা আশু সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থার একটা সন্তোষজনক প্রতিকার ব্যতীত মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ সংশয়াকুল। বণিকসুলভ মনোবৃত্তির পশ্চাতে যে-জিঘাংসাবৃত্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহারই নির্মম অভিব্যক্তি—জগদ্ব্যাপী হানাহানি, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মারণতাণ্ডব এবং আণবিক বোমার প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ।

এই সঙ্কটের সমাধান কে করিবে? League of Nations বা U. N. বা অন্য কোন জাতিসংঘ দ্বারাই যে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর হইবে, সমসাময়িক ইতিহাসে ইহার সমর্থন এখনও পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আদর্শগত মনোবিপ্লব ভিন্ন অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে ইহা সম্ভব নহে।

শিক্ষার উন্নত আদর্শের ভিত্তিতেই মানুষের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। সেইজন্যই প্রয়োজন একটা মহৎ শিক্ষাদর্শের ; কেবল কারিগরী ও অর্থকরী শিক্ষার অনুশীলনে এতাবৎ দেশের যেটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে—তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৃথা। অনাধ্যাত্মিক, আদর্শবিহীন কারিগরী ও অর্থকরী বিদ্যার চর্চায় জাপানের যে-শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় একমাত্র জাতি জাপানের, শত বৈভব ও সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, জগতের ভাণ্ডারে দিবার মত কোন সম্পদ নাই। জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা করিবার সময় এই কথাটাই সর্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সম্পদ জগতে অতুলনীয়। হাত পাতিয়া জগতের নিকট হইতে আমরা লইয়াছি অনেক, আবার আমাদের কবি, দার্শনিক ও চিন্তা-নায়কগণের হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। কেবল অর্থোপার্জনের তাগিদে কারিগরী শিক্ষাকে বড় করিয়া দেখিলেই চলিবে না। বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, কমার্স ও অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যার চর্চা আরও হউক। কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে দেশ আবার সম্পদশালী হইয়া উঠুক—ইহা সর্বজনকাম্য।

কিন্তু শিক্ষার বুনিয়াদ স্থাপিত হওয়া উচিত একটা উচ্চ আদর্শের উপর। সেইজন্যই তাত্ত্বিক শিক্ষাকে বাদ দিলে চলিবে না। তাত্ত্বিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল কার্যকরী বা অর্থকরী শিক্ষার উপর জোর দিলে মারাত্মক ভুল করা হইবে। শিক্ষাব্যবস্থার যাঁহারা নিয়ামক ও শিক্ষা-

নীতির যাঁহারা প্রবর্তক, তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে, একটা well-balanced পরিকল্পনা ব্যতীত একদেশদর্শী প্রথার প্রবর্তনে দেশের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। বর্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনার হিড়িকে এই বিষম ভুলটিই করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। Basic এবং Technical & Industrial Education-প্রসারের দিকেই যেন সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি প্রয়োগ করা হইতেছে। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও কলাবিদ্যার কথা যেন অনেকে ভুলিয়াই গিয়াছেন এবং এই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও যেন সরকার ও জনসাধারণের অনাদরে ক্রমশঃ অবনতির পথেই চলিয়াছে। ইহা অশুভ লক্ষণ এবং ইহার পরিণাম মন্দ।

যে-কোন শিক্ষার পিছনেই যদি একটা উচ্চ ভাব ও আদর্শ না থাকে, তবে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক শিক্ষার যথাযথ অনুশীলন না হইলে সমস্ত শিক্ষাধারা একটা স্থূল, প্রাণহীন প্রয়াসে পর্যবসিত হইবে এবং ইহার ফল হইবে জাতির পক্ষে ঘোর অকল্যাণকর।

আন্তর্জাতিক আদর্শ

দার্শনিকপ্রবর অ্যারিস্টটলের সময় হইতে এ পর্যন্ত বহু মনীষী নানাভাবে ও নানা কথায় শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য লইয়া বহুক্ষেত্রেই বিতর্কমূলক আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে, কিন্তু কোন শেষ মীমাংসা হয় নাই। পৃথিবীর নানা জাতি স্বীয় জাতীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূলে নানাভাবে শিক্ষার আদর্শ রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ শিক্ষার এত বহুবিধ সংজ্ঞা রহিয়াছে যে, তাহা হইতে বাছাই করিয়া এমন একটি সংজ্ঞা স্থির করা কঠিন—যাহা দ্বারা সর্বকালে, সর্বদেশে ও সর্বজাতীয় মানুষ ও সমাজের শিক্ষার একটি পূর্ণাদর্শ গঠন করা যাইতে পারে। শিক্ষাদর্শন-সম্বন্ধীয় যে-কোন পুস্তকের পাতা উল্টাইলেই উপরি-উক্ত ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক নহে, তাহা প্রতীয়মান হয়। শিক্ষার যে-সব সংজ্ঞা সাধারণ্যে প্রচলিত, তাহাদের অধিকাংশই হয় একদেশদর্শী এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ও সঙ্কীর্ণ অথবা অত্যন্ত ব্যাপক ও অস্পষ্ট। রাগ্‌বি স্কুলের প্রধানশিক্ষক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডাঃ আর্ণল্ডের শিক্ষাদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল "To make a Christian Gentleman"। এ-আদর্শ ডাঃ আর্ণল্ডের সময়ে এবং ইংরাজ অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট যতই লোভনীয় হউক না কেন, উহা কখনই সর্বদেশ ও সকল জাতীয় মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

"Education brings out the perfection already in man"—শিক্ষার এই সংজ্ঞা খুবই উচ্চাদর্শসঞ্জাত কিন্তু এত ব্যাপক যে, সাধারণের নিকট অনধিগম্য।

প্রাচীন গ্রীসীয় সভ্যতা যে-শিক্ষাদর্শের ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল, তাহাকে মূলতঃ দুই শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) স্পার্টার আদর্শ, (২) এথেন্সের আদর্শ। প্রাচীন স্পার্টার শিক্ষাগুরু ছিলেন লাইকার্গাস ও প্রাচীন এথেন্সের শিক্ষাগুরু ছিলেন সোলোন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, Lycurgus made machine and Solon made man—অর্থাৎ লাইকার্গাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্পার্টা রাজ্যের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রাপ্রণালী কতকগুলি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত—অপরপক্ষে এথেন্সের প্রজাগণ ছিল এক আদর্শ গণতন্ত্রের স্বাধীন অধিবাসী। স্পার্টা ও এথেন্সের পারস্পরিক বৈষম্য যাহাই থাকুক না কেন, সমগ্র-ভাবে গ্রাসীয় সভ্যতায় যে-শিক্ষাদর্শ আদৃত ও গৃহীত হইত, তাহা সংক্ষেপে এই—

প্রাচীন গ্রীসীয় শিক্ষাদর্শ মানুষকে যেমন একদিকে শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ ও নিয়োজিত করিত, তেমনি অপরপক্ষে সর্বনাশা গৃহবিবাদে প্ররোচিত করিয়া পরিণামে সমাজ-ধ্বংসেরও কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীসীয়গণ দেশসেবা ও রাজনীতি-চর্চাতেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ উদ্যম নিঃশেষ করিত। গ্রীসের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত এত প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কোন রাজনীতিক

রাজনৈতিক-রঙ্গভূমে স্থানচ্যুত হইয়াছেন, তখনি একদল নির্বাসিতকে দলবদ্ধ করিয়া স্বীয় দেশ বা নগর আক্রমণ করিয়া নিজ নষ্ট প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন।

ইহারই ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখা যায় প্রাচীন চীনের ইতিহাসে। প্রাচীন চীনের কোন ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজপুরুষ গ্রীসীয় রাজনৈতিকের পথ অবলম্বন না করিয়া শান্তমনে নিজ অদৃষ্টকে মানিয়া লইয়া দূর পাহাড়ের কোলে নির্জন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাব্যালোচনায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতেন। অথচ আপাতদৃষ্টিতে এই উভয় দেশেই যেন একই শিক্ষাদর্শের প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন এথেন্সের বালকদিগকে যেমন হোমারের কাব্য কণ্ঠস্থ করিতে হইত, তেমনি প্রাচীন চীনের বালকগণও কনফুসিয়াসের উপদেশাবলী সযত্নে শিক্ষা করিত। উভয় দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল দেব-দেবী ও পূর্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব-পোষণের পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্যকারী।

ধর্মশিক্ষা ও দেবদেবীর পূজার্চনা বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এই দুই সুপ্রাচীন শিক্ষাদর্শ স্বাধীন চিন্তাশক্তি-বিকাশের বিরুদ্ধতা করে নাই। বরঞ্চ নানাভাবে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কল্পনার পরিপোষণই ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এতগুলি সাদৃশ্যযুক্ত লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত দুই আদর্শ ছিল পরস্পর ভাববিরোধী এবং সেই বৈষম্যের মূল নিহিত ছিল দুই জাতির পরস্পর-বিরোধী প্রকৃতির মধ্যে। গ্রীসীয়গণ ছিল

উদ্যমশীল ও কর্মঠ, আর চৈনিকগণ ছিল স্বভাবতঃ নিরুদ্যম ও কর্মবিমুখ। এবং ইহারই ফলে গ্রীসীয় সভ্যতা হইল আত্মঘাতী, আর চৈনিক সভ্যতা হইল বৈদেশিকের হাতে নিগৃহীত। চৈনিক সভ্যতা শিল্প ও স্থিতিস্থাপকতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে সমর্থ হয় নাই। কাজেই ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, সুপ্রাচীনতার মর্যাদায় মহিমান্বিত হইলেও কি গ্রীসীয়, কি চৈনিক—কোন শিক্ষাদর্শকেই নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রগতিশীল জাতিই শিক্ষার যে আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে, সহজ কথায় তাহাকে জাত্যাভিমানী আদর্শ বলিয়া অভিহিত করা যায়। যুদ্ধ-পূর্ব জাপান যে আদর্শে তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছিল, উক্ত জাত্যাভিমানী আদর্শের উহাই সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জাতীয় গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বকেই সর্বতোভাবে শিক্ষার চরম ও পরম কাম্য বলিয়া গণনা করা হইত। নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইতালীয় শিক্ষাদর্শও জাপানী শিক্ষাদর্শের অনুরূপ। তথাকথিত এক্সিস জাতিসমূহের শিক্ষাদান-নীতির গোড়ার কথাই ছিল জাতির যুব-শক্তিকে বাক্যে, কর্মে ও চিন্তায় জাতীয় গৌরব-বর্ধনে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করা। ইহাতে এক দিক দিয়া যেমন তড়িৎগতিতে একটা সমগ্র জাতি ও সমাজ আত্মসচেতন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি অপরপক্ষে জাতীয় গৌরবের নামে জাত্যাভিমান, দম্ভ ও অসহিষ্ণুতা সমস্ত জাতির

মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার পরিণাম হইল মারাত্মক—জাতীয় গৌরববৃদ্ধির ছলে অন্য জাতির অস্তিত্ব-বিলোপের ও সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের এক তীব্র লালসায় মানুষ হিংস্র ও দুর্বার হইয়া উঠিল—যাহার ফলে পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাসমর ও বর্তমান শোচনীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। জাত্যভিমানী শিক্ষাদর্শের ইহাই হইতেছে প্রধান দোষ।

মধ্যযুগীয় জেসুইট্ (Jesuit) সম্প্রদায়ের শিক্ষানীতি ও জাপানী শিক্ষানীতির মধ্যে একটা মূলগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই উভয় নীতিই একটা কঠোর মতবাদের অনুবর্তী। জাপানী শিক্ষানীতির নানাবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও যেমন পরিণামে বিষময় ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তেমনি জেসুইট-নীতিও উহার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফরাসী দেশে প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া এমন কতকগুলি জাতীয় ও সামাজিক গলদ সৃষ্টি করিয়াছিল—যাহার বিলোপসাধনের জন্য ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের ন্যায় এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই উভয় নীতিই স্নেহ, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি মনুষ্য-প্রকৃতির কোমল প্রবৃত্তিসমূহের পরিপন্থী। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনই এই উভয় নীতির গোড়ার কথা। ব্যক্তিকে বাদ দিয়া সমষ্টি বা জাতিকেই এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রাধান্য দিয়া থাকে। বর্তমান জাগতিক পরিস্থিতিতে এই সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী আদর্শ যে গ্রহণের একান্তই অযোগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

তাই এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শান্তিকামী বিশ্বমানব আজ কোন্ আদর্শে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে? শিক্ষাদর্শের উপর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। কুশিক্ষার প্রভাবে কিরূপে একটা জাতি সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও সুখ নষ্ট করিয়া দিতে পারে—তাহার নির্ভুল সাক্ষ্য বিগত দুই মহাযুদ্ধের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যাহাতে ইতিহাসের এই শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর সংঘটিত না হয়, তাহারই উপায়-নির্ধারণে UNESCO'র সৃষ্টি। এই সংসদের উদ্বোধন-সভায় মনীষী রাধাকৃষ্ণন তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে বলিয়াছেন,—"If the world is to be saved from mass violence and scientific destruction, if mankind is to be delivered from the menace of war, a new spirit should govern human relationship. The future of the world depends upon our capacity to restore the dignity of man and his creative independence. If we are not to abandon civilization to chance, we must educate humanity to live according to the dictates of mind and spirit and not to surrender to the way of instincts and interests. We must learn to-day the art of disobedience."

শিক্ষার একটা আন্তর্জাতিক আদর্শের আজ একান্তই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরলোকগত এইচ, জি, ওয়েলস্

তাঁহার "World Brain" গ্রন্থে একটা পথের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ওয়েলস্ ছিলেন একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের পক্ষপাতী। এই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দেশ ও জাতিনির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির উপযোগী এক অখণ্ড শিক্ষাদর্শ রচিত হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য ; যে আদর্শ কোন জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন না করিয়া মানবতার মহিমাকেই কীর্তিত করিবে। মানবত্বের সুমহান ভিত্তির উপরই হইবে এই আন্তর্জাতিক শিক্ষানীতির বনিয়াদ গঠিত। কিভাবে এই নীতি প্রবর্তিত ও প্রচলিত হইতে পারে, UNESCO প্রতিষ্ঠান তাহারই উপায়-নির্ধারণে ব্যাপৃত। আন্তর্জাতিক শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল আপত্তি স্বভাবতঃই উত্থাপিত হইতে পারে। আপত্তিটি এই,—তবে কি জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক আদর্শের যূপকাষ্ঠে বিসর্জন দিতে হইবে? UNESCO প্রতিষ্ঠানকে এই আপত্তিও খণ্ডাইতে হইবে। জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিলোপসাধন না করিয়াও যে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির ভিত্তির উপর এক বিশ্ব-আদর্শের সৌধ গঠিত হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

শিক্ষার আন্তর্জাতিক আদর্শের কথা বাদ দিলেও শিক্ষার যে কয়টি মৌলিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য সর্বদেশে, সর্বকালে ও সবশ্রেণীর মানুষের পক্ষে কল্যাণপ্রসূ তাহা এই :—

১। মানুষকে আইনসম্মতভাবে ও সদুপায়ে জীবিকা-উপার্জনের উপযুক্ত করা।

২। মানুষকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব-পালনে সচেতন ও সক্ষম করিয়া তোলা।

৩। মানুষের প্রচ্ছন্ন শক্তির যথাবিধি প্রস্ফূরণ ও তাহাকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে জীবন উপভোগ করিবার সামর্থ্য-দান।

সু-শিক্ষার এই মৌলিক লক্ষণ তিনটি পরস্পর-বিরোধী নহে। এই তিনটির যে-কোন একটিকেও বাদ দিয়া কোন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাবিধি রচিত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ কার্যকরী শিক্ষা। ইহার আবশ্যকতা সর্বজন-স্বীকৃত। প্রত্যেক নাগরিককে তাহার জীবিকানির্বাহের উপায়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা যে-কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। শিক্ষার যত পরিকল্পনা এ পর্যন্ত রচিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই কার্যকরী শিক্ষা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ইদানীং ভারতবর্ষে দুইটি শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা অহরহই শোনা যায়, 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' (Wardha Scheme) এবং 'সার্জেণ্ট পরিকল্পনা' (Sargent Scheme)। এই উভয় পরিকল্পনাই কার্যকরী শিক্ষাকে তাহার যথোপযুক্ত মূল্য দিয়াছে। কেবলমাত্র সাধারণ সাহিত্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই রাষ্ট্র বা সমাজের কর্তব্য শেষ হয় না—শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা বিষয়েও যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা ভিন্ন কোন জাতি স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারে না; তাহার শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই কার্যকরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর আজকাল শিক্ষাবিদ্গণ বিশেষ-

ভাবে জোর দিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ আমলে এই দেশে যে শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া অদ্যাবধি চলিতেছে, তাহাতে কার্যকরী শিক্ষাকে তাহার প্রাপ্য মূল্য দেওয়া হয় নাই। তাহার কারণ, ইংরাজ শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল, শাসনকার্যের সুপরিচালনার জন্য এক কেরানী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা। পরে অবশ্য অবস্থার চাপে উক্ত নীতির কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন-অনুপাতে ছিল একান্তই অকিঞ্চিৎকর। আজ এই কেরানীকুল-সৃষ্টিকারী অসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘ দিন একাধিপত্যের ফলে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের ভিতর যে তীব্র বেকারসমস্যা দেখা দিয়াছে (অবশ্য যুদ্ধের দৌলতে সাময়িকভাবে বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছিল) তাহার সমাধান অল্প-স্বল্প সংস্কার দ্বারা সম্ভব নয়। তাহার জন্য চাই শিক্ষাব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন।

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় সেই আমূল পরিবর্তনের নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। কথাটা এই,—বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কার্যকরী শিক্ষার আগ্রহাতিশয্যে সাধারণ সাহিত্যিক শিক্ষা (general literary education) অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হয়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার ইহাই একটা প্রবল ত্রুটি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিতে পাই, যে, কোন ব্যবসায় বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় উর্ধ্বতম ও নিম্নতম

শ্রেণীর ব্যক্তিগণের কোন বিশেষ কার্যকরী শিক্ষা (Technical Training) থাকে না। যে-কোন উর্ধ্বতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও নিম্নতম দিন-মজুর প্রায়শঃই বিশেষজ্ঞ নহে।

শিক্ষা-ক্ষেত্রেও এই কথাটা বেশ খাটে। আজকাল ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের খুব চাহিদা দেখা যাইতেছে। কিন্তু ট্রেনিং-প্রাপ্ত হইলেই যে শিক্ষক আদর্শস্থানীয় হইতে পারিবেন, এমন কোন কথা নাই। ট্রেনিং কেবলমাত্র শিক্ষাদান-প্রণালীর কতগুলি প্রধান ধারা নির্দেশ করিয়া দেয়—কিন্তু শিক্ষকতার উৎকর্ষ নির্ভর করে শিক্ষকের স্বীয় গুণবত্তার উপর। C. E. M. Joab বলেন, "Any teacher who is worth his salt teaches by the light of nature. Those who cannot teach naturally will never become good teachers, however hard they try and however much instruction they receive and had better taken up another profession. Hence the more general education and the less technical that a teacher receives, the better."

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ। প্রত্যেক নরনারীকে শিক্ষালাভের সমান সুযোগ দেওয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়াই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নহে। ইহাও দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেক নরনারীই স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে পারে। সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে স্বীয়

দায়িত্ব-পালন ও অধিকার-রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন ও সক্ষম হয়, তাহাও গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শের একটি প্রধান লক্ষ্য। যে জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান যুগে দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাতে স্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক ঔদাসীন্য বর্তমান যুগে আত্মবিলোপেরই নামান্তর। রাষ্ট্রশাসনের গণতান্ত্রিক আদর্শকে সার্থক ও সফল করিয়া তুলিতে হইলে প্রথমেই চাই নাগরিকদের দায়িত্ববোধ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান। শিক্ষানীতির ভিতর দিয়াই সুস্থ ও সুফলপ্রদ রাজনৈতিক চেতনা জন্মান সম্ভব। গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য।

তারুণ্যের সঙ্কট

যে বিশিষ্ট ভাবধারার অনুসরণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারই প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া পাশ্চাত্ত্যের একদল মনীষী বিংশ শতাব্দীকে "যৌবন যুগ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ঊনবিংশ ও বিংশ এই উভয় শতাব্দীই প্রগতির যুগ। বলিতে গেলে বিজ্ঞানের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবন-নিয়ন্ত্রণ—ইহাই হইতেছে এই দুই শতাব্দীর মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীকে পরস্পরের অগ্রগামী ও অনুগামা বলিয়া অভিহিত করা যায়। এবং আপাতদৃষ্টিতে উভয়ের বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই অধিকতর স্পষ্ট ও প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা কি প্রকৃতই সত্য? একটু বিশ্লেষণ করিলেই এই আপাতসাদৃশ্যের অন্তরালে দুইটি ভিন্নমুখী ভাব ও আদর্শের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীকে কোন কোন পাশ্চাত্ত্য মনীষী "Age of Stability বা "স্থিতিশীলতার যুগ" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সত্য বটে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানের নবজন্ম ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান হইয়াছিল; সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজবিধান প্রভৃতি সভ্যতার যাবতীয় বিভাগেই এই যুগে যুগান্তকারী বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু এই যুগান্তরকারী ও বিপ্লবাত্মক ভাবসংঘর্ষের অন্তরালেও প্রচ্ছন্ন ছিল একটা সংরক্ষণশীল ও সাবধানী মনোবৃত্তির রক্ষাকবচ—যাহার সাহায্যে

উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সমাজ এক প্রচণ্ড ও ব্যাপক ভাববিপ্লবের মুখে তৃণখণ্ডের মত অকূলে ভাসিয়া যায় নাই। আবার ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইংরাজ জাতির মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য অধিকতর সুপরিস্ফুট। ধীর পদক্ষেপে ইংরাজ জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আকস্মিক বিপ্লবের উত্তেজনায় ইংরাজ জাতি কখনও পুরাতন ও পরীক্ষিত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথ গ্রহণ করে নাই। অথচ নিঃশব্দ ও রক্তপাতহীন বিপ্লবের পথেই ইংরাজ জাতির বহুমুখী প্রগতি অব্যাহত চলিয়াছে। ইহাই ইংরাজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। একমাত্র ক্রমওয়েলের (Cromwell) সময়েই বোধ হয় কিছুটা ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিপরীতধর্মী ক্রমওয়েলের পরিচালিত বিপ্লব সেই জন্যই ইংলণ্ডের ভূমিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হয় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর যে বৈশিষ্ট্যকে আমরা স্থিতিশীলতা বা stability আখ্যায় ভূষিত করিয়াছি, তাহার আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। নতুবা উনবিংশ ও উহার পরবর্তী শতকের মূল ভাবধারার পার্থক্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিজ্ঞতার উপর আস্থাকেই এই রক্ষণশীলতার নামান্তর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ নূতনকে গ্রহণ করিবার পূর্বে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তাহার খাঁটিত্বকে পরখ করিয়া লওয়া। এই রক্ষণশীল মনোবৃত্তির প্রভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর সুদূর ফলপ্রসূ নানা পরিবর্তন বিপ্লবের উগ্ররূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া ক্রমবিবর্তনের

প্রশান্ত রূপেই দেখা দিয়াছিল। এবং শেষে যখন হিসাব-নিকাশের বিবরণী (Balance sheet) রচিত হইল, তখন দেখা গেল যে, প্রায় অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে আমরা আমাদের যাত্রাস্থল হইতে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের অগ্রগতি সত্যই বিস্ময়কর।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রক্ষণশীলতা বা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা নবীনের জয়যাত্রার গতিবেগ মন্দীভূত করিয়া ফেলে না কি ? কথাটা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। রক্ষণশীল দেখিয়া শুনিয়া, ভালমন্দ বিচার করিয়া, যথেষ্ট-পরিমাণ সময় লইয়া যাহা করিবে, উগ্র চরমপন্থীর দল অধীর আগ্রহে মুহূর্তেই সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে চাহিবে। তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে রক্ষণশীলের পন্থাই যে অধিক ফলপ্রসূ, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইতিহাসের সাক্ষ্য রক্ষণ-শীলেরই পক্ষে।

ঊনবিংশ শতকের ভাবধারার যে বৈশিষ্ট্যের কথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই একটা দিক হইতেছে প্রবীণতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান-প্রদর্শন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই শতকের আর এক নাম "ভিক্টোরীয় যুগ" (Victorian Age)। এই যুগের নরনারীর মধ্যে প্রবীণতার প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধাশীলতা লক্ষ্য করিবার বস্তু। বয়স্ক, প্রবীণ ও অভিজ্ঞতা-বহুল ব্যক্তিরা জনসমাজে নানারূপ সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। সমাজ নির্বিচারে তাঁহাদের নির্দেশ ও নেতৃত্ব

মানিয়া চলিত। তরুণের দল প্রবীণকে বাদ দিয়া কোন আন্দোলন বা কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্যোগী হইবার কথা চিন্তা করিত না। প্রবীণের কর্তৃত্বের নিগড় হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর নবীন স্বাধিকারপ্রমত্ত হইবার দুঃস্বপ্ন দেখিত না। তারুণ্যকে জীয়াইয়া রাখিবার নির্লজ্জ চেষ্টা তো ছিলই না, বরঞ্চ অনেকে কৃত্রিম উপায়ে হইলেও অকালে প্রবীণতার আভিজাত্য-অর্জনে প্রয়াসী হইতেন। বেশভূষায়, চলাফেরায় ও অন্যান্য নানাভাবেই এই মনোভাব মূর্ত হইয়া উঠিত। বোধ হয় এই কারণেই ভিক্টোরীয় যুগের ভদ্রব্যক্তিরা যৌবনের গণ্ডী অতিক্রম করিবার পূর্বেই সযত্নে গুম্ফ ও শ্মশ্রুর পরিচর্যা ও পরিবর্ধন করিতেন। এমন কি তরুণীরাও যথাশীঘ্র সম্ভব maiden হইতে matron-এর পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্যে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিতেন। বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত হাবভাবটাই প্রবল। "How to look young at forty"-জাতীয় চটকদার এই বিজ্ঞাপন বিংশ শতাব্দীর প্রবীণার গতপ্রায় যৌবন ও সৌন্দর্য অটুট রাখিবার মন্ত্রগুপ্তি ও সঙ্কেত। প্রবীণ ও প্রবীণার দল যৌবনকে বিদায় দিতে নিতান্তই নারাজ। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয়। তাই চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী যৌবনকে বাঁধিয়া রাখিতে নানা কৃত্রিম কৌশলের আবিষ্কার!

যৌবনের জয়গান-মুখরিত এই বিংশ শতাব্দী। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে দিকে দিকে যুব-আন্দোলনের

প্রসার। প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ—এই যুব-অন্দোলনের প্রধান অনুপ্রেরণা। স্কুল-কলেজ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক নানা ক্ষেত্রেই যুব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যৌবন স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুচতুর রাজনীতিক ও সমাজ-নেতা যুব-সম্প্রদায়কে আপন আপন কার্যসিদ্ধির উপায়রূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ইটালীতে মুসোলিনীর De Polovona মুভমেণ্ট এবং জার্মানীর Hitler Jugend. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যুবসম্প্রদায়কে ক্ষেপাইয়া তোলা এক অতি সুপরিচিত অস্ত্র। এদেশেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই যথা,—Muslim Students' League, Students' Congress, Students' Federation, Students' Bureau ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজনীতি তরুণ-তরুণীগণকে পাইয়া বসিয়াছে। অন্যূন ৯।১০ বৎসর বয়স হইতেই তাহারা কোন না কোন একটা রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। ফলে গৃহে মাতাপিতা বা অভিভাবকের এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বহুলাংশে খর্ব হইয়া গিয়াছে। তৎস্থলে পার্টি বা দলের কর্তৃত্ব ও প্রভাবই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আজ আর তরুণের দল তাহাদের কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে প্রবীণের মুখাপেক্ষী নহে। প্রবীণকে বাদ দিয়া, এমন কি উপেক্ষা করিয়া হইলেও, আজ নবীনের দল নব যাত্রাপথে গমনোন্মুখ। প্রবীণের উপদেশ ও কর্তৃত্বের আজ নির্মম অবসান ঘটাইয়াছে নবীন।

সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নিয়মশৃঙ্খলার বাধা-বন্ধন প্রায় ধূলিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তরুণের দল নবলব্ধ মুক্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদে ও উল্লাসে আজ আত্মহারা—

"রক্ত-আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।"

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দলীয় স্বার্থসাধনের জন্য যে ধুরন্ধর নেতৃবর্গ এক সময়ে যুবসম্প্রদায়কে কৌশলে নিজের কাজে লাগাইয়াছিলেন—তাঁহারাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আত্ম-সচেতন যুবসম্প্রদায় আজ তাঁহাদের কর্তৃত্বের আওতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আজ আর তরুণের দল নির্বিচারে নেতৃবৃন্দের জয়ধ্বনি দিয়া শোভাযাত্রার পুরোভাগে পতাকা বহন করিতে রাজী নহে।

"টাকাকড়ি লোকজন করিয়াছ জড়ো,
শহীদ হইয়া সবে দেশকর্ম করো।
হাসিল হইলে কাজ জয়ধ্বনি দিয়া
শোভাযাত্রা কর মোরে পুরোভাগে নিয়া।"

এ হেন নেতৃত্বাভিলাষীর বাক্‌চাতুরীজালে আর তাহারা আবদ্ধ হইবে না। প্রবীণের সমস্ত ফাঁকি তাহারা ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা নিজ নেতৃত্বে বিশ্বাসী এবং কোন রকম আপোষ-মীমাংসায় তাহারা রাজী নহে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ধর্মঘট এবং আপোষ-নিষ্পত্তিতে ধর্মঘটীদের অনমনীয় মনোভাবই ইহার লক্ষণ। আজ তরুণ-তরুণীর দল কাহারও উপদেশে কর্ণপাত করিতে, মাথা পাতিয়া কাহারও আদেশ মানিয়া লইতে এবং প্রচলিত নিয়মশৃঙ্খলার বিধিনিষেধ পালন করিতে নিতান্তই নারাজ। ডিসিপ্লিনের পিঞ্জর বড়ই অসহনীয়; মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় তাহারা অনন্ত আকাশে খেয়ালখুশি-মত উড়িয়া বেড়াইতে চায়। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, প্রবীণ নেতৃবৃন্দই অনেকক্ষেত্রে এই দুর্বার যুবশক্তিকে সংযত ও সংহত করিতে না পারিয়া শেষটায় যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন! ইহারই বাস্তব অভিব্যক্তি দেখিতে পাই তরুণতরুণীদের প্রধান মিলনকেন্দ্র স্কুল ও কলেজগুলিতে। আজ হইতে ১০।১৫ বৎসর পূর্বেও এমন অবস্থা কেহ দেখে নাই বা ভাবে নাই যে, ছাত্রবৃন্দের পছন্দ বা অপছন্দের উপরেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বা অধ্যক্ষের চাকুরির মেয়াদ নির্ভর করে। এমন অবস্থা কেহ কল্পনাও করে নাই যে, পরীক্ষাগৃহে অবৈধ উপায়-অবলম্বনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার অপরাধে শিক্ষক-তত্ত্বাবধায়কের জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা।

অবশ্য এই গেল এক দিক। আবার অন্যদিকে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক যুবসম্প্রদায় যে-পরিমাণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। তরুণের দল নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, প্রবীণের অভিভাবকত্ব ছাড়াও তাহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে সক্ষম।

কিন্তু লাভ-লোকসানের অঙ্ক খতাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যুবসম্প্রদায় অন্য এক বন্ধনের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা সত্য যে, গৃহে পিতামাতা, বিদ্যালয়ে শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতৃবৃন্দের অধিকার ও ক্ষমতা আজ অনেকাংশেই খর্ব ও পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজের বন্ধন একদিকে যেমনই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই অন্যদিকে দলীয় নিয়মনির্দেশের বন্ধন কঠোর হইয়া উঠিতেছে। তরুণ-তরুণীকে আজ আর নিজের কথা নিজেকে ভাবিতে হয় না, নিজের স্বার্থ নিজে রক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। তৎস্থলে দল বা পার্টিই তাহার কথা ভাবিতেছে এবং তাহার সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করিতেছে। পার্টি বা দলের নির্দেশ (mandate) ব্যতীত তাহার কিছুই করিবার উপায় নাই। অভিভাবকের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইয়া তরুণ যে নূতন দলীয় অভিভাবকত্ব (party guardianship) স্বীকার করিয়া লইয়াছে, উহা যে তাহার পক্ষে খুব কল্যাণকর হইয়াছে তাহা নহে ; কিন্তু ইহাই যুগধর্ম, ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ তরুণকে একটা কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার প্রকৃত কল্যাণ কোন্ পথে ? বিগত দুই মহাযুদ্ধের বিষম পরিণাম হইতে আমরা এই সত্যই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, যে-তরুণের দল একটা রাজনৈতিক বা দলগত আদর্শের অনুপ্রেরণায় নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিল, আজ তাহার স্বার্থই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন। মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজার

যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে।

—রবীন্দ্রনাথ

—লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

জনশিক্ষার কথা

অন্য দেশ (ভ্রমণ)

আপন দেশ (ভ্রমণ)

Never Too Late (Educating)

Educational Etcetera (In the Press)

নিবেদন

এদেশে বয়স্কশিক্ষা-আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সাধারণের ধারণা, স্কুল-কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থাই দেশের শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়াও এবং প্রত্যেক বালকবালিকাকে বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য কর, তবেই দেশের সব লোক শিক্ষিত হইয়া উঠিবে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। স্কুল-কলেজের নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে এবং শিক্ষণীয় বয়ঃসীমাতিক্রান্ত সংখ্যাবহুল নরনারীর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও উদাসীন অথবা অজ্ঞ।

আজ দেশ-বিদেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় 'বয়স্ক-শিক্ষা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। স্কুল-কলেজীয় শিক্ষার অসম্পূর্ণতা বা অপূর্ণাঙ্গতা-দূরীকরণের জন্যই ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতরাষ্ট্রের নাম নববিধানে অন্যান্য বহুবিধ জাতীয় সমস্যার ন্যায় বয়স্কশিক্ষা-সমস্যাও তুল্য মর্যাদালাভ করিয়াছে। এ কথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত যে, কোটি কোটি নিরক্ষর এবং অজ্ঞ দেশবাসীকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিয়া দেশের উন্নতিসাধন অসম্ভব ও অবাস্তব।

ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্নরাজ্য- সরকার বয়স্কশিক্ষা-আন্দোলন পরিচালনায় বদ্ধপরিকর। প্রায় নয় বৎসর

পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে বয়স্কশিক্ষা-আন্দোলন অনুসৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হইতেছে। সরকারী ও বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলন-পরিচালনায় উদ্যোগী হইয়াছে। বয়স্কশিক্ষার সংজ্ঞা আজ আর সঙ্কীর্ণার্থক নিরক্ষরতা-নিবারণেই সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু বৃহত্তর অর্থে ইহা বুঝায় সমাজ-শিক্ষা অথবা 'Training for citizenship and training for life'.

সমাজশিক্ষা-আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন যোগ্য কর্মীর। কর্মিগণের ট্রেনিং বা শিক্ষণ-ব্যবস্থা সমাজশিক্ষা-পরিকল্পনার একটি অতি বড় কথা। এই পুস্তকে সমাজশিক্ষা-কর্মীর জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

বৎসর কয়েক পূর্বে 'জনশিক্ষার কথা' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং জনশিক্ষা-কর্মিগণ উহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'সমাজশিক্ষার ভূমিকা'-ও কর্মিগণের উদ্দেশ্যেই রচিত হইল। কর্মিগণের সমাদর লাভ করিলেই লেখকের শ্রম সার্থক হইবে। এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধই ইতঃপূর্বে 'শিক্ষাব্রতী', 'শিক্ষক' ও 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সুযোগে তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

—গ্রন্থকার

ও খাদ্যসঙ্কট এই অশুভ ত্র্যহস্পর্শের যে বিষময় ফল আজ সারা পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন ও জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা মূলতঃ সেই আদর্শ-স্বাতন্ত্র্যসম্ভূত মহাযুদ্ধেরই (War of Ideologies) শোচনীয় পরিণাম। এবং এই মহামন্থনজাত হলাহল পরিণামে ভবিষ্যৎ জগতের আশাভরসাস্থল এই তরুণসম্প্রদায়কেই হয় নীলকণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিয়া জগৎকে বাঁচাইতে হইবে, নতুবা সেই হলাহলে নিজেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

মনীষী রঁমা রঁলার বাণী আজ অনুধাবন করিবার সময় আসিয়াছে—"Let youth never divorce thought from action."

যে জাতি বা সম্প্রদায় তাহার ভাবনাচিন্তার ভার অপর কোন ব্যক্তি বা দলের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিত বসিয়া থাকে, তাহার কোনও ভবিষ্যৎ নাই। ইহার প্রধান উদাহরণ নাৎসী জার্মানী। আজ তরুণসম্প্রদায়কে এই বিষয়েই অবহিত হইতে হইবে।

শেষ

॥ ওরিয়েণ্টের শিক্ষা-নীতির বই ॥

শিক্ষা।	মহাত্মা গান্ধী।	দুই টাকা আট আনা ॥
স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা।	হুমায়ুন কবির।	আট টাকা ॥
প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ।	অনাথনাথ বসু।	এক টাকা ॥
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা।	সুধীরচন্দ্র কর।	চারি টাকা ॥
সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা।	সুধীরচন্দ্র কর।	পাঁচ টাক ॥
জনশিক্ষার কথা।	নিখিলরঞ্জন রায়।	তিন টাকা ॥
সমাজ ও শিশুশিক্ষা।	প্রতিভা গুপ্ত।	পাঁচ টাকা ॥
সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা।	প্রতিভা গুপ্ত।	আট টাকা ॥
শিশু-পরিবেশ।	সমীরণ চট্টোপাধ্যায়।	পাঁচ টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষা।	বিজয়কুমার ভট্টাচার্য।	দুই টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি।	বিজয়কুমার ও সাধনা।	দুই টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ১ম।	অনিলমোহন গুপ্ত।	দুই টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য়।	অনিলমোহন গুপ্ত।	তিন টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন।	অনিলমোহন গুপ্ত।	তিন টাকা ॥
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি।	অনিলমোহন গুপ্ত।	আড়াই টাকা ॥
নয়া-শিক্ষা।	ফণিভূষণ বিশ্বাস।	তিন টাকা বারো আনা ॥
শিক্ষার নূতন পথে	শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী।	দুই টাকা ॥
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রবেশিকা।	বিমল দাশগুপ্ত।	দুই টাকা ॥
প্রাথমিক শিক্ষা।	রেণু মিত্র।	চারি টাকা ॥
নঈ তালিম।	ধীরেন্দ্র মজুমদার।	দুই টাকা ॥
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক।	রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।	চারি টাকা ॥
জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন।	রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।	এক টাকা বারো আনা ॥
ছোটদের কবিতাশেখা।	সুনির্মল বসু।	দেড় টাকা ॥
ছন্দের গোপন কথা।	সুনির্মল বসু।	এক টাকা ॥
Never Too Late	... N. Roy	Rs. 3/- ॥
Education in Modern India	... Prof. A. N. Basu	Rs. 6/- ॥

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥ কলিকাতা-১২ ॥